KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5·5"x8·5"
Vol. & Number : 18/4 20/1 20/2 20/4 21/1	Year of Publication : Aug 1954 Sep 1955 Dec 1955 June 1956 Sep 1956
	Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

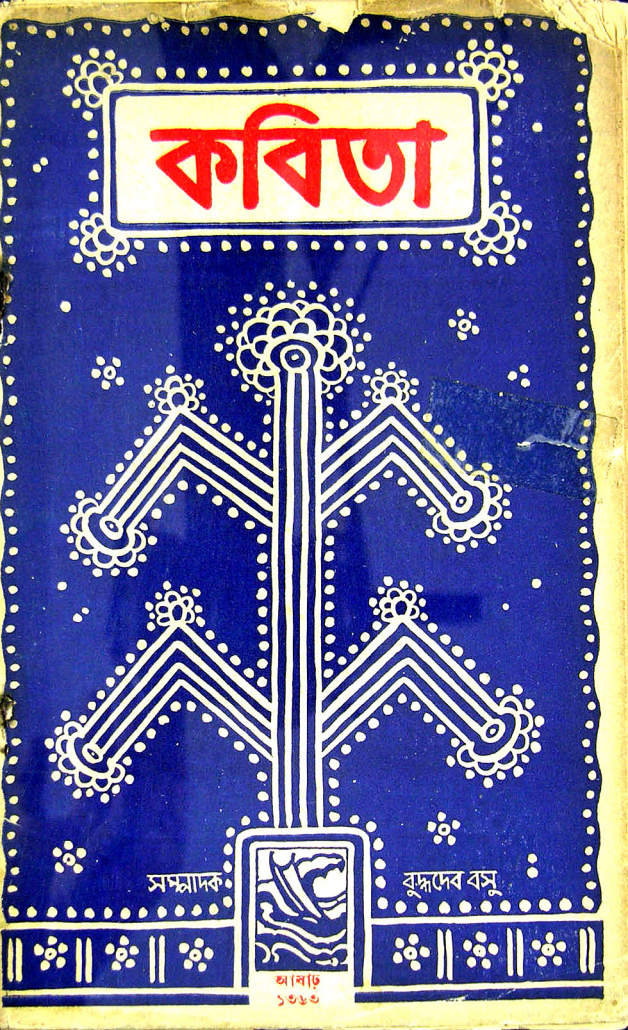
কবিতা
সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু
আষাঢ়
১৩৬৩

কবিতা

উনবিংশ বর্ষের
সম্পূর্ণ সেট
এখনো
পাওয়া যাচ্ছে।

●

কবিতা,
অনুবাদ-কবিতা
ও
প্রবন্ধের
মূল্যবান সঞ্চয়ন।

●

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা
এই সেটের
অন্তর্গত।

●

চার টাকা
ভি. পি. ৪৸৵০

লেখকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'য় প্রকাশের জন্য যাঁরা রচনা পাঠাতে চান, নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি:

(১) লেখা ফেরৎ পেতে হ'লে যথোপযুক্ত স্ট্যাম্প-সমেত ঠিকানা-লেখা খাম সঙ্গে দেবেন।

(২) যদি লেখা ফেরৎ না চান, কিন্তু সম্পাদকের সিদ্ধান্ত জানতে চান, তাহ'লে ঠিকানা-লেখা পোস্টকার্ড পাঠালেও চলতে পারে। সম্পাদকের 'মতামত' কোনোক্রমেই জানানো সম্ভব নয়।

(৩) লেখকের নাম ও ঠিকানা পাণ্ডুলিপির উপরে বা নিচে স্পষ্টভাবে লেখা থাকা প্রয়োজন।

(৪) রচনার সঙ্গে স্ট্যাম্প না-পাঠিয়ে, পরে তা ফেরৎ চাইলে বা সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে কোনো ব্যবস্থা করাই সম্ভব নয়।

(৫) বুক-পোস্টে রচনা পাঠালে সঙ্গে কোনো পত্র পাঠাবেন না।

(৬) আমরা ছদ্মনামের পক্ষপাতী নই, কিন্তু কোনো লেখক তা ব্যবহার করলে তাঁর প্রকৃত নাম ও ঠিকানাও জানাবেন।

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৩

— এই সংখ্যায় —

কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
বিষ্ণু দে
অমিয় চক্রবর্তী
লোকনাথ ভট্টাচার্য
অশোকবিজয় রাহা
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
শামসুর রাহ্‌মান
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী
সৈয়দ শামসুল হক
যশোদাজীবন ভট্টাচার্য
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
বিকাশ দাশ
সুশীলকুমার গুপ্ত
সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত
শান্তিকুমার ঘোষ
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
দুর্গাদাস সরকার
অর্চন দাশগুপ্ত
বুদ্ধদেব বসু

অনুবাদ

শার্ল বোদলেয়ার থেকে ... বুদ্ধদেব বসু
কার্ল স্যাণ্ডবার্গ থেকে ... ফখরুজ্জামান চৌধুরী

প্রবন্ধ

সমালোচনার স্বাধিকার ... সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা ... জ্যোতির্ময় দত্ত

লেখকদের বিষয়ে

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক সংখ্যাতেই দিতে চেষ্টা করবো, কিন্তু প্রত্যেক সংখ্যায় প্রত্যেক লেখকের বিষয়ে উল্লেখ নাও থাকতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তী-র সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "পালা-বদল" (প্রকাশক : নাভানা) সম্প্রতি নিখিল-বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্যসম্মেলন কর্তৃক ১৩৬২-তে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্যগ্রন্থ হিশেবে পুরস্কৃত হয়েছে। এই পুরস্কার ইতিপূর্বে পেয়েছেন জীবনানন্দ দাশ ('বনলতা সেন'), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('সংবর্ত') ও বুদ্ধদেব বসু ('শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর')। **অশোকবিজয় রাহা**-র আদি নিবাস শ্রীহট্টে ; বর্তমানে ইনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপনা করছেন। **অর্চন দাশগুপ্ত** থাকেন নয়া দিল্লিতে, 'কবিতা'য় সম্প্রতি এঁর লেখা বেরোচ্ছে। **কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত** ঢাকার প্রাক্তন অধিবাসী, বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন-বিভাগে কর্ম করেন। **জ্যোতির্ময় দত্ত**-র জন্ম ১৯৩৬-এ ; এঁর কবিতা গত এক বছর ধ'রে 'কবিতা'য় প্রকাশিত হচ্ছে। ***দুর্গাদাস সরকার** 'একক' পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়** নানা পত্রিকার লেখক। **প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত** কলকাতায় ও শিমলেতে থাকেন ; এঁর কবিতা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ***ফখরুজ্জমান চৌধুরী** ঢাকার তরুণ লেখকদের অন্যতম। **বিষ্ণু দে**-র অনুবাদ-সংগ্রহ 'হে বিদেশী ফুল' নামে ছাপা হচ্ছে ; প্রকাশ করছেন বাক্। **বিকাশ দাশ** নয়া দিল্লির বাসিন্দা ; কয়েক বছর ধ'রে 'কবিতা'য় লিখছেন। **বুদ্ধদেব বসু**-র নতুন উপন্যাস 'শেষ পাণ্ডুলিপি' এম. সি. সরকার থেকে শীঘ্র প্রকাশিত হবে। ***যশোদাজীবন ভট্টাচার্য** নতুন লেখক, হালিশহরে থাকেন। **রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী** ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। **লোকনাথ ভট্টাচার্য** পড়াশুনো করেছেন শান্তিনিকেতন, কলকাতা ও প্যারিসে, বর্তমানে পণ্ডিচেরিতে সরকারি কর্মে নিযুক্ত আছেন। **শান্তিকুমার ঘোষ** অর্থনীতির অধ্যাপক, এঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'এ শুধু নিসর্গ নয়' শতভিষা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। **শামসুর রাহমান** ও **সৈয়দ শামসুল হক** ঢাকায় থাকেন। 'কবিতা'য় এঁদের লেখা ইতিপূর্বে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। **সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়** ও ***সুশীলকুমার গুপ্ত** কলকাতায় চাকরি করেন, **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত**-র নতুন কাব্যগ্রন্থ 'দশমী' সিগনেট প্রেস কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ; এঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'স্বগত'র পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ যন্ত্রস্থ। **সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত** বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৩
বিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮৬

দুটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

আন্তর্জাতিক

"টোমাটোর লাল রস ঝকঝকে ছোট্ট গেলাসে
তারি পাশে শাদা-ফেনা শ্যাম্পেন, হলদে লেসের
জালি-কাটা পাত্রে খুদে কেক, ডিপ্লমাসি দ্রুত জমে
মসৃণ চাকায় ঘোরা আতিথ্যের ঘরে, দামী ধোঁয়া,
উচ্চ কণ্ঠ টেবিলের চতুর্দিকে ; স্বামী সামনে গিয়ে
প্লেটে তুলে দেন কচি শসা আর চীজ-স্যাণ্ডুয়িচ,
দুজনায় সন্তর্পণে মান্য রাষ্ট্র-দেহ-ভিড় ঠেলে
দাঁড়ালো মস্ত কাচ-দেয়ালের ধারে, দৃষ্টি খোলা,
নিরালা সোনায় ঢাকা জেনিভার নিস্তরঙ্গ লেক,
শৈল-কিরীটে সন্ধ্যা, ধক ক'রে বুকে জেগে ওঠে—

"সেই অস্ট্রিয়ান গ্রামে কবে বোন টুপি ভ'রে আনে
ভায়োলেট সদ্য গুচ্ছ বাড়ির বাগান থেকে ভোরে
গান করতে-করতে, আজ মা'র জন্মদিন তাই, মাঠে
পাহাড়ি ঢালুতে শস্য কাঁচা সোনা, স্তূপীকৃত ; ছিল
অগাধ তৃপ্তির তলে বাপের আশঙ্কা যুদ্ধ হ'লে
ডাক পড়বে ; তারপর ? তারপর ছারখার, ভাঙা
টুকরো য়ুরোপে দেশী-বৈদেশিক সৈন্য বুট-পরা
ঘরে দোরে শ্মশানের রক্ত ভস্ম চীৎকারে বিক্রমে

নাৎসি কিংবা ডেমক্রাসি কিংবা কম্যুনিস্ট বন্দুকের
চূড়ান্ত উৎসব আনে ; কোথা বাপ, কোথা বোন, ভাই,
মায়ের কান্নাও থামল সেদিন বুলেট লেগে, আমি
রাশি-রাশি জনতায় হারিয়ে হেঁটেই চলি, ট্রেনে
বার-বার বোমা পড়ে, তবু উঠি, দৌড়িয়ে বাহিরে
ছুটে যাই, ভাঙা ব্যাগ শক্ত হাতে, খিদে মাথা চেরে,
কাদের শিকার চলে,—

"সুস্মিত, পালিশ-মূর্তি ফিরে
তাঁদেরি অনেকে আজ ককটেলে প্রচুর কৌশলী
অনবদ্য পার্টি দেন, সেই যৌথ নেতা দলে-দলে
সস্ত্রীক মেশেন এসে গোলাপি নেশার কক্ষে, মনে
'ক্ষমা করো, ক্ষমা চাই' বার-বার বলি, দগ্ধ ক্ষোভ
নিভিয়ে আপন-লজ্জা ভরে, ক্ষত শোকে ; অভ্যাসের
ভগ্নাংশ কথায় নামি, খেতে-খেতে সসেজ বা কফি,
জামায় হীরের ব্রোচ, হৃদয়ে আগুন জলে মিছে—
ইনি এ কে ?

"মস্ত হাত কর-মর্দনের ব্যগ্রতায়
হাসিতে এগিয়ে দেন, 'সুখ-সন্ধ্যা', স্বল্প চেয়ে ফের
আমার স্বামীর দিকে, 'হর্ অ্যাম্বাসাডর, ইনি বুঝি
মাডাম ক্যোনিগ্ ? প্রীত, আপনাদের দেখে বড়ো প্রীত,
সুখ-সন্ধ্যা ! মাডামকে মার্টিনি দেবো কি, কিংবা প্লেটে
কিছু ক্যাভিয়ার ?' এ কী, আমার স্বামীর মুখে চোখে
সংযম-অতীত কোন আধি নামে, একটু স'রে গিয়ে
ইথিওপিয়ন মন্ত্রী আর নব্য পোলিশ কন্সাল
তাদের পিছনে দেখি আমার জর্মান স্বামী থেমে

এড়ান সুখের সান্ধ্য আহ্বানকারীর সুবচন,
পরে একটু ব্র্যাণ্ডি চেখে, স্থির হ'য়ে বললেন আমায়
'চলো যাই।' 'কেন ?' 'ঐ বিশেষ দেশের ঐ যাকে
দেখলে জেনারেল, বুকে বত্রিশ মেডেল-তারা-ফিতে
ছড়াছড়ি, ওরই প্ল্যানে সেই রাত্রে যুদ্ধ-শেষ ক্ষণে
সমস্ত শহর ওরা পুড়োলো, ধ্বংসের ধ্বজা তুলে
নিজে এলো সারি-সারি প্যারাসুট-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে,
কিছুই রইল না বাকি।' 'কিন্তু ক্রিটজ্, তুমি আমি জানি
তোমার আমার ভিন্ন দেশে-দেশে উন্মাদ পর্বের
কত কীর্তি স্বজনেরা পরস্পর আত্মঘাতী মোহে
জালিয়ে তুললো, এল আটলান্টিকের পার থেকে
ক্রুদ্ধ মৃত্যুবিষ আরো ; ভোলা নয়, সব রেখে মনে
বেঁচে থাকা অন্য ভাবে তাও কি সম্ভব ?' স্বামী শুধু
দ্বিধায় সম্মতি-মেশা মাথা নেড়ে, চেয়ে রন্ দূরে—
ভিড় যেন স'রে গেছে, প্রলাপ-আলাপে তীক্ষ্ণ জমা
ফরাসী গন্ধের বাষ্প, রমণীয় সিল্কের দ্যুতি,
ধবধবে সিদ্ধ শার্ট, কালো জামা সব অন্তর্হিত,—
অগণ্য প্রশ্নের শুধু তারা জলে বাহির আকাশে,
ঘরে ঢোকে আল্প্স্-এর সুপ্ত রাত্রি ; 'চলো, রবিবার
কাল যাই শামোনিতে, সূর্যোদয়ে।' 'বেশ, তা-ই চলো।'
প্রতিশ্রুতি ঠেকে এসে জীবনের ঊর্ধ্ব গিরিলোকে।"

এর মধ্যে শুভ্র কেশ, তাপসিক মুখে স্নিগ্ধ হাসি
সুর বেনেগল্ রাও ঈষৎ সলজ্জ সম্ভাষণে
বিদায় নিলেন, শান্তি দূর দেশ থেকে ছুঁল এসে,
সঙ্গে-সঙ্গে ওরা ছুটি দরজা খুলে দাড়ালো বাগানে ॥

কাইরোর ভোরে

আকাশ-খাড়াইয়ে দেখি জ্যোতিঃখচা সমাচার
শূন্যের দেয়ালে রশ্মি-আঁকা
সর্বমস্মি : প্রাচীন অক্ষর।
অবধূত সন্ন্যাসী ধুলোর
নির্বাণী ঔদাস্য তাকে কালে-কালে
মোছেনি প্রলেপে ; ঝড় দৈবের তাণ্ডব শৈব নাচে
রেখেছে অদ্বৈত তাকে, আদি হোম
আগুন-ঝলসানো গায়ে।
যদিও মিশরে আছি দৃষ্টি ঠেলে পিরামিডে উঁচু,
তারো পারে পুরোনো আকাশে,
—জগৎধারিণী শূন্য ত্রিকোণের অনুকৃতি এই
এরা তুলেছিল ধ'রে—
তবুও শাশ্বত মন ভারতী ওংকৃত পড়ি পাঠ
নীল-নদী-মাতৃকের দেশে,
মেশাই দ্রাবিড়-আর্য আদি সূর্য স্তবে
আধুনিক হেলিয়োপলিস্
—উট সারি চলেছে সংসারে।

দশমিক

বিষ্ণু দে

কর্মে আর ব্যক্তির প্রত্যহে,
সাধ-সিদ্ধি এপারে ওইপারে
বিচ্ছেদের দুস্তর বন্যায়
কান্না ফুলে ওঠে অহরহ,
হৃদয়ে জীবনে সংসারে
মিল চায় শুদ্ধ যন্ত্রণায়,
অন্তহীন দশমিক বাধা
অন্তরের বৃত্তে বাদ হানে।

ধ্যান কেন কখনোই কায়া
প্রত্যক্ষে পাবে না মনোমতো ?
আপতিক কেন এ অন্যায়,
কেন কাব্যে নেই সুর সাধা,
রং নেই খোদাই পাষাণে,
ছবি কেন নয় স্পর্শগত ?
জীবনে মননে মাঝে বাঁধা
সর্বদাই অধরার ছায়া !

মন তাই অসাধ্যের গানে
অনন্যে বা কোনো অনন্যায়
কালোত্তর মুহূর্তের মায়া
খোঁজে নিত্য কালিন্দী বিষাদে ;
মহামান্যে অথবা কন্যায়
মানুষের মহাহৃদয়ের

মেটে না মেটে না অশনায়া,
তৃষ্ণা শুধু তিক্ত পারাবারে।

কেউ তাই মাথা নত করি
ক্ষণিকার শ্লিষ্ট শোচনায়,
কেউ বা মাথুরে মাথা খুঁড়ি,
কেউ মাতি সক্রিয় সম্বাদে
নিত্য পরাজিত বিজয়ের
অক্ষত সত্তার রচনায়,
যেখানে দ্বৈত সদা হারে
অদ্বৈত ভগ্নাংশে কোল নেয়॥

দুই অপরাহ্ণ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

১

দিন হ'লো ক্রূর শুষ্ক দীর্ঘায়ু প্রয়াস
ক্ষণ তার যত বাঁচে তত মরে ক্ষোভার্ত মরণে—
এলো না যে তার বুকে নিরুদ্ধ নিশ্বাস—
যত বাঁচে তত মারে যা-কিছু চাওয়ার ছিলো তার
দিন হ'লো যেন কার অকৃতার্থ কবিতার মতো

তার চোখে তার দুটি সকরুণ চোখের পাতায়
প'ড়ে এলো বেলা

তোলো চোখ আজ এই আসন্ন সন্ধ্যায়
তাকাও আমার দিকে
তাকাও যখন রক্ত এখনো থমকে আছে দূর
আকাশের কোণায়-কোণায়

বলো একবার
মরলো না প্রবাহিণী এলোমেলো এধার-ওধার
ঘুরে শেষে অকস্মাৎ মরুগর্ভে, পড়লো না বেলা
কোথাও পড়ে না বেলা, ওপারে আগুন আছে
আছে কথা সব শুষ্কতার
জ্যোতিহীন আত্মা নয় তামসী রাত্রির
বলো অর্থ আছে, তুমি বলো মুক্তি আছে
মৃত্যুঞ্জয় যুক্তি আছে নিরর্থক আজকে সন্ধ্যার

সে শুধু রইলো ব'সে নিষ্পলক নীরব প্রণয়

আর তার চোখে তার সকরুণ চোখের পাতায়
ধীরে-ধীরে অন্ধকার ঘনতর হলো

২

ব'সে আছি এইখানে, কখন বেলা পড়বে। আমার তিন পা জমিতে কখন সূর্যের শেষ আলো ঝলকাবে। আর আমি তাকে আক্রমণ করব !

বও, হাওয়া বও—তোমার কাছে চাওয়ার কিছু নেই, তুমি আমার ভাই। এই আকাশ আমার ভাই, এই হাওয়া আমার ভাই, এই অরণ্য আমার ভাই।

আর ঐ আলো, তাকে আমি আজ কামড়ে ধরবো—তাই ব'সে আছি অন্ধকারে। চারপাশে এই হাওয়া, এই পাগল-করা হাওয়া, এই অরণ্য, এই বাদল-মেঘের আকাশ।

বুকে ব্যথা—তোমরা শোনো গো, কী ব্যথা, কী উত্তাল আগমনী সুর!

যদি সে না আসে, তবে মরবার আগের শেষ ক্ষণটিতে ছুঁড়ব বাণ, যেন তার হৃদয় বিদ্ধ হয়, যেন রক্ত ছলকে ওঠে হঠাৎ ফল্গুর মতো। সেই রক্ত নিয়ে সন্ধ্যার আকাশ হবে রঞ্জিত এক দিন—সেই রক্ত নিয়ে জাগবে প্রেম তোমার হৃদয়ে।

আর যদি সে আসতে-না-আসতে মিলিয়ে যায়, তার পিছনে ছুটবো আমি উন্মত্ত শিকারী। আমার পায়ের দাগ ধ'রে যা-কিছু অচেতন জলবে বেদনায়—যেখানে মরু, সেখানে ছুটবে নদী।

আলো নাম নিলো বিজ্ঞান, আলো নাম নিলো সুর। আলো বললো আমি দেখেছি যা অন্ধকার দেখেনি। তাই আমার সমস্ত নাড়ি, সকল শিরা আজ পাগল হ'য়ে উঠেছে অবশেষে তাকে বাঁধতে চেয়ে, তার গলা টিপে ধরতে চেয়ে, যদি দৈবাৎ যে-বিরাট সত্য সে লুকিয়ে রেখেছে, তার লক্ষ কণিকার একটি কণাও পিছলে বেরিয়ে আসে !

যদি দৈবাৎ হঠাৎ জানতে পারি, চিরকেলে অজ্ঞানের নয় এই পথ অভিশপ্ত, ফুল হ'য়ে কেন ফুটলো না সকল বেদনা, কেন আমি অনর্থক কথার পসরা সাজাই, বাড়াই আমার পাপ—যদি জানতে পারি আমরা সকলে যাবো ঐ পারে, দুয়ারে বাজবে শঙ্খ।

বও, হাওয়া বও—তোমার কাছে চাওয়ার কিছু নেই, তুমি আমার ভাই।

দুটি কবিতা

মিনতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঝড় দিসনে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে

থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরু দীপের শিখা
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে
একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা।

দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা
ব্যথার দাগ যদিও আঁকে প্রেমিক কাপুরুষ
সওদাগর ভৃত্য এক, বাঁচার ভয়ে মরা।

ঝড় দিসনে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে

আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে
ঝিকমিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীরু দীপের শিখা
প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুঁয়ে।

বিবৃতি

উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনতিরিশে এসে
গর্ভবতী হ'লো, তার মোমের আলোর মতো দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে বিন্দু-বিন্দু রক্তে অবশেষে
যন্ত্রণার বন্যা এলো, অন্ধ হ'লো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বলি আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক।

দিবসার্ধ পায়ে হেঁটে ফিরি আমি, জীবিকার দাসত্ব-ভিখারী,
ক্লান্তি লাগে সারারাত, ক্লান্তি যেন অন্ধকার নারী।
একদা অসহ্য হ'লে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা
যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে, আলোর স্বরূপে,
মাংসের শরীর তার শুভক্ষণে সব ক্লান্তিহরা
মণ্ডূকের মতো আমি মগ্ন হই সে-কন্দর্প-কূপে।

তার সব ব্যর্থ হ'লো, দীর্ঘশ্বাসে ভরালো পৃথিবী,
যদিও নিয়ম, নিষ্ঠা, স্বামী নামে স্বল্প-চেনা লোকটির ছবি
শিয়রেতে ত্রুটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খস্তনে
পূজার বন্দনা বাজে আদিগন্ত রাত্রির নির্জনে।
সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর
আমার নির্মম হাতে সঁপেছে বুকের উপকূল,
তারপর শান্ত হ'লে সুখে-দুঃখে কামনার ঝড়
গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশা ফুল।

বাঁচাতে পারবে না তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু,
হবিষ্যান্ন-পুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হ'লো মরণসম্ভবা
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা
দোষ নেই দায়ে প'ড়ে যদি বা তর্জনা করে যীশু।

চতুর্দশপদী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সময়

সময়, তোমাকে আমি কী ব'লে যে সম্বোধন করি
সে-কথাই ভাবি। কী রূপকে আছো বাঁধা জীবনের
গ্রন্থিতটে ; তুমি তুল্য যৌবনের কোন উপমায়
সে-প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আজো ; বারংবার চাঁদ ও শর্বরী
তোমাকেই খুঁজে-খুঁজে ক্ষ'য়ে যায়, পরম স্নেহের
কৈশোর যৌবন হ'লো, দন্তহীন বার্ধক্য ঝিমায়
প্রবীণ দীপ্তির শেষে ; সর্বত্রই আয়ুর সোপানে
জন্মহীন অন্তহীন অবজ্ঞাত লগ্নের সন্ধানে

নিরন্তর পরিক্রমা ; তোমাকে যে দেখবো কোথায়
স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে, জানি না তো। কেবল দেখেছি
তোমার খণ্ডিত রূপ জগতে জীবনে নানারূপে ;
প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, চুম্বনের গাঢ় সান্ত্বনায়
অথবা হিংসায় দ্বেষে, বেদনার, বঞ্চনার স্তূপে
আমরা সবাই কিন্তু তোমাকেই শরীরে মেপেছি ॥

উৎকণ্ঠা

'If, O my Lesbia, I should commit…'

অন্য কেউ যদি থাকে তার কাছে যাওয়াই সংগত
এই নব ঋতুলগ্নে ; তোর এই স্মরণীয় দিনে
যাবি অল্প বয়সের প্রেমিকের কাছে পথ চিনে,
অপূর্ব সন্ধিতে হবে উপত্যকা প্রণয়সম্মত।

তরঙ্গসংকুল তোর শরীরের শুভ্র স্তরে-স্তরে
নদী, দ্বীপ, উপত্যকা, পাহাড়ের অমলিন চূড়া
সুবিন্যস্ত, ইন্দ্রিয়গোচর। তুই তাই ভারাতুরা ;
নবীন যুবক তোকে নিয়ে যাবে শোভন বন্দরে।

সে-ই ভালো। কিন্তু তুই আসবি না কখনো এদিকে
উত্তরযৌবন এই ছদ্মবেশী শুভার্থীর কাছে—
যার স্পর্শে মৃত্যু তোর ; প্রেমহীন কামনাই আছে
যে জন্তুর বিদ্যুৎ-নখরে। যার হিংস্র পাংশু ফিকে
বিধ্বস্ত যৌবন তোকে সন্নিধানে পেলেই বিকারে
পোড়াবে বরাঙ্গ তোর, পুড়বে তা ব্যর্থ হাহাকারে ॥

কার্ল স্যাণ্ডবার্গের কবিতা

অনুবাদ : ফখরুজ্জামান চৌধুরী

প্রবাহ

সমুদ্রের বালু রক্তিম হয়
যেখানে গোধূলির আলো পৌঁছয় আর কাঁপে।
সমুদ্রের বালু হলদে হয়
যেখানে চাঁদ ঝুঁকে প'ড়ে দোল খায়।

ক্ষতি

ভালোবাসি আমি
একটি শিশু,
একটি ব্যাঙ্গো
এবং প্রতিবিম্ব
(ঈশ্বরকে হারালেই
সব হারাবো
এবং একদিন
আমরা ধ'রে থাকবো
শুধু প্রতিবিম্বগুলি।)

সত্যি

হলদে ধুলো আছে
মৌমাছির পাখায়,
ধূসর আলো আছে
কোনো নারীর জিজ্ঞাসু চোখে,
লাল ধ্বংসাবশেষ আছে
পরিবর্তনশীল সূর্যাস্তের জলন্ত অঙ্গারে ;

আমি তোমায় নিই এবং উঁচু ক'রে
ধরি তোমার স্মৃতি।
মৃত্যু তার নখ বিস্তার করবেই জানি
তার ওপর, যাকে আমি নিই।

পছন্দ করো

একক সুদৃঢ় কুয়াশা উত্তোলিত এবং প্রস্তুত,
অথবা খোলা জিজ্ঞাসার হাত প্রসারিত, অপেক্ষমান,
পছন্দ করো :
কেননা, আমরা পরিচিত হই একের অথবা অপরের দ্বারা।

উতল বসন্তে

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

ছায়া-কাঁপা ভীরু আমলকি বন
পেরিয়ে পুকুর জর্দাবরন ;
পরপারে সারি-সারি নারিকেল ;
বাতাবি গন্ধে হাওয়া উদ্বেল ;
পশ্চিমে মাঠ সীমানাবিহীন ;
আকাশে চাঁদের থালা অমলিন ;
শিমুলের ডালে তিতিরের স্বর—
বুঝিনি সেদিন সে-ও নশ্বর ॥

আজ যৌবন। নাগরিক ঋণ
শোধ করে মন। বিবিক্ত দিন।
রাতের আকাশ বেদনা-মৌন,
বন্দী-চোখের সে-ছবি গৌণ ॥

কান্ত বাবুর কর্নেটে আর
বাজে না সিন্ধু-বারোয়াঁ বাহার ॥

সমালোচনার স্বাধিকার

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রায়শ্চিত্তের যে-বিধি সাম্প্রতিক বামাচারের দারুণ দুর্লক্ষণ, তার সংক্রমে সনাতন আত্মশুদ্ধিও আজ রুগ্ন ; এবং আত্মহত্যার এই দুরূহ প্রণালী যখন স্বপ্নের গোচরে আসেনি, তখনই ফ্রয়েড্ প্রচার করেছিলেন যে অহমিকায় স্বভাব ও অভাব সমানুপাতিক। তাহলেও আপনার সমালোচনা পরজন্মের জন্যে তুলে রাখতে আমি অপারগ ; এবং গত কয়েক বছর ধ'রে আমার প্রাক্কালীন পন্থ আমাকে কেবলই লজ্জা দিয়েছে। উক্তি ও উপলব্ধির অনৈক্য, চিত্রকল্পের পরিবর্তে কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার, ভাষার সুবিধাবাদী বিকার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাব্যের যত উপসর্গ, সব কটাই আমার পুরাতন লেখায় বর্তমান ; এবং ভাব না বদ্‌লে, ওই দোসাবলীর সংস্কার আদৌ সম্পাদ্য কিনা, সে-গবেষণায় আমি ইদানীং অনেক সময় কাটিয়েছি। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও ফল পাইনি ; এবং এই পণ্ড শ্রমে চেষ্টার কার্পণ্য ততখানি পরিষ্কার নয়, যতটা স্পষ্ট কবিতার প্রকৃতি। কারণ আবেগমূলক রচনায় অভিজ্ঞতা আর অভিব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ থাকে না ; এবং আমার তদানীন্তন অনুভূতি নিজস্বের ধার ধারত না ব'লেই, আমার আত্মপ্রকাশ সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির আশ্রয়।

উপরের আবিষ্কারে অহংকারীর কপট বিনয় প্রচ্ছন্ন কিনা, তা মনোবিজ্ঞানের বিধানেই আমার অবিদিত ; এবং জ্ঞাতসারে আমি যেহেতু কবিযশের প্রার্থী, সম্ভবত তাই আমার অচেতন আত্মবিজ্ঞাপন স্বরচিত কবিতার নির্মম নিন্দায় নিরত। তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি যে আমার পূর্বতন গদ্যে অনুশোচনার হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল ; এবং সে-জন্যে কৃতজ্ঞতাভাজন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সন্নিকর্ষ, যাতে স্বপ্রাধান্যের অবকাশ নিতান্ত নগণ্য। অর্থাৎ "স্বগত"-এর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ সত্যসত্যই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ ; এবং আপন ভুল-ভ্রান্তির উদ্ভেদ সে-তর্কের মুখ্য অভিপ্রায় ব'লে, সেখানে বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়। ফলত আমার অল্পবয়স্ক গদ্যে, রূপের আভাস না থাক, রীতির ইঙ্গিত হয়তো আছে ; এবং ফরাসী সমালোচকদের মতে রীতি আর রচয়িতা অভিন্ন বটে, তবু প্রকারী নিশ্চয় তখনই প্রকারের প্রয়োজন বোঝে, যখন বাধে বহির্বিশ্বের

সঙ্গে স্বোপলব্ধির বিবাদ। তার পরে শিল্পী যে-শৈলীর শরণ নেয়, বিষয়ীর বিষয়নিষ্ঠাই তার উপজীব্য ; এবং উদ্দেশ্য আর উপাদানের সহযোগ যেমন সাহিত্যনামে পরিচিত, ব্যক্তিস্বরূপ তেমনই আত্ম-পরের সন্ধি।

নব্য বঙ্গের এক খ্যাতনামা কবি সদ্যপ্রকাশিত "স্বগত"-এ চারিত্রের স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছিলেন ; এবং উক্ত যদৃচ্ছালব্ধ বৈশিষ্ট্য তাঁরও চক্ষুশূল কিনা সে-সংবাদ আমি রাখি বা না রাখি, এতে বোধহয় আমাদের মতভেদ নেই যে আমার গদ্য এখনও ওই বিড়ম্বনায় বিপন্ন। অর্থাৎ কালক্রমে আমার ভাবনা যদিও ভেক বদলেছে, তবু তার স্বভাব শোধরায়নি ; এবং বয়সে হঠোক্তির সাহস ফুরিয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের খেয়ালী আদর্শে আমার আপত্তি আজও প্রবল। অবশ্য এ-বই যখন প্রথম বেরোয়, তখনই এর অনেক নিষ্পত্তিতে আমার সম্মতি ছিল না ; এবং গত সতেরো-আঠারো বছরে আর কিছু না শিখলেও, আমি এখন বুঝি যে আস্তিকের ভগবান যেমন পূর্ণ ব'লে বিদ্যমান, সার্থক শিল্পবস্তু তেমনই বিদ্যমান ব'লে সর্বগুণাকর। তাহলেও রূপকার অবতার নয় ; এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচারে নিরুৎসাহ কেবল মরমীরা, যাদের বাক্যস্ফূর্তিই বিশ্বব্যাপী বিপ্রলাপের চূড়ান্ত প্রমাণ। অপরে অগত্যা যুক্তির শরণাপন্ন ; এবং সে-যুক্তিও পারমার্থিক নয়, উপায়বিশেষ উদ্দেশ্যের সহায়, না অন্তরায়, তাই তার বিবেচ্য।

তার মানে এমন নয় যে বর্তমান গ্রন্থ সর্বত্রই ন্যায়শাস্ত্রের অনুগামী ; এবং আমার তর্কসূত্র বহু স্থানে বিচ্ছিন্ন ব'লেই, "স্বগত" প্রাতঃস্মরণীয়দের নাম-সংকীর্তনে উন্মুখর। পক্ষান্তরে আমার পল্লবগ্রাহী বুদ্ধি পাণ্ডিত্যপরাঙ্মুখ ; এবং উল্লিখিত মনীষীদের পর্যালোচনা দূরের কথা, তাঁদের মন্ত্রে দীক্ষা নিলে, পাছে হিতে বিপরীত ঘটে, তাই আমি আপ্তবাক্যের উদ্ধার সুদ্ধ যথাসাধ্য এড়িয়ে গেছি। উপরন্তু এই দিক্‌পালদের যে-ব্যাখ্যা সর্বগ্রাহ্য, তা সময়ে সময়ে আমার পরিপন্থী ; এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বিষয়ে প্রচলিত মতবাদ জেনেও, সংকটে তাঁদের সাক্ষী ডেকে আমি হয়তো শেষরক্ষার পথ পর্যন্ত খুইয়েছি। অন্তত আমার এক দার্শনিক বন্ধু এক বার রটিয়েছিলেন যে আমার গদ্যে ভাব যে-কার্যে নিযুক্ত, পদ্যে তার নির্বাহ ভাবচ্ছবির কর্তব্য ; এবং যদিও এ-টিপ্পনীর টীকা আবশ্যক, তবু আমি যেকালে কবিত্বের উপযাচকমাত্র, তখন অব্যর্থ

উপসংহার আমার অনিষ্ট নয়, আমি অগত্যা সন্তুষ্ট পরিণামী সামঞ্জস্যে। তবে "স্বগত"-এ সংগতির উদাহরণ বিরল ও বাহ্য ; এবং সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিও নির্বিকল্প সমাধির মুখাপেক্ষী।

পক্ষান্তরে মার্কিনী উপযোগবাদের আদিপুরুষ চার্লস্ পেয়র্স অনুমান করেছিলেন যে নিরবধি কালের অন্তিম মুহূর্তেই চিৎশক্তির সর্বশেষ প্রতিনিধি সত্যের বিবর্তনসাপেক্ষ স্বরূপ দেখতে পাবে ; এবং যেহেতু আমার বিকল্পনা সুদ্ধ ভূচর, তাই তাঁর সঙ্গে সে-পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত যেতে না পারলেও, আমি অগত্যা মানি যে অন্তত সাহিত্যচর্চায় প্রয়োগ ব্যতীত মিথ্যার নিরসন সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ-বই যে-সকল প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞায় কণ্টকাকীর্ণ, সেগুলোর প্রত্যেকটা তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিত হয়নি ; এবং সেই জন্যে আমার বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল যে তিলোত্তমার অনধিকার প্রবেশে কাব্যলক্ষ্মীর মন্দির যেমন অশুচি, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চিত্তও তেমনই বিক্ষিপ্ত। তথাচ আমি যেহেতু রসসামগ্রীর সন্ধানেই অন্বীক্ষার দ্বারস্থ, তাই আমার মতামতে অনুবন্ধের শৈথিল্য হয়তো অল্প-বিস্তর মার্জনীয় ; এবং আমার অপ্রাসঙ্গিক অপসিদ্ধান্তের স্বপক্ষেও এ-কথা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য যে "স্বগত"-এর পটভূমি প্রথম মহাসমর, যার বিরতি সাম্প্রতিক সর্বনাশের প্রস্তাবনামাত্র। সে-শোকাবহ নাটকের উপরে এখনও যবনিকা নামেনি ; এবং ইতিমধ্যে, উত্তরের নিরুক্তি দূরে থাক, তার মুখ্য প্রশ্নও আমাদের কানে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ।

অতএব মনে রাখা উচিত যে উপস্থিত প্রবন্ধাবলীর একাধিক বিসংবাদ পাত্রঘটিত নয়, যুগব্যাধির বহুরূপী উপদ্রব ; এবং রুষ বিপ্লব-সম্বন্ধে আমার প্রাগ্রসর হতাশা যেমন সমবয়সী ছাড়া আর কেউ হৃদয়ঙ্গম করবে না, তেমনই যাদের শৈশব হিন্দু পুনরুন্নয়নের অন্তঃপাতী নয়, তাদের কাছে আমার উদগ্র জড়বাদ উপহাস্য ঠেকবে। কিন্তু কাব্যব্যবসায়ীর অভিমানলাঘবে আমার ক্লান্তিকর নির্বন্ধ আপাতত রোমান্টিক্ আতিশয্যেরই প্রতিবাদ বটে, তবু সেই সঙ্গে কবিদের সম্পর্কে আমার অদম্য উচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই আড্‌লার-বর্ণিত দৈন্যগ্রন্থির সাক্ষ্য ; এবং প্রত্যেক গূঢ়ৈষায় দুর্লভ দ্রাক্ষার অম্ল রস নিহিত থাক বা না থাক, আমি যখন না মেনে পারি না যে শিল্পশুদ্ধি ঐকান্তিক প্রয়াসের পুরস্কার, তখন আমার পক্ষে সাধারণ্যের সাধুবাদ ভূতের মুখে রামনামের মতো।

আসলে এই রকম দ্বন্দ্বসমাসের বাহুল্য আমার মজ্জাগত ব'লেই, "স্বগত"-এর সর্বত্র সমস্কার এত প্রাদুর্ভাব, অথচ সমাধানের চিহ্ন নেই ; এবং জীবনে অদ্বৈতের অভাব সত্ত্বেও আমি যেহেতু বেঁচে আছি, এখনও আত্মঘাতী হইনি, তাই অনুরূপ বৈকল্যের অভিযোগে এ-বইখানার প্রাণদণ্ড অবিচার।

দুঃখের বিষয় স্বভাব সর্বদা নিরপরাধ, কদাচ নির্বিকার নয় : অন্ততঃপক্ষে নাচতে না জানার দায় সব সময়ে বাঁকা উঠানের উপরে চাপানো যায় না ; এবং দু নৌকায় ভর ক'রে ভবনদী পেরোনোর বিপক্ষে "স্বগত" যদিও শতমুখ, তবু আমার লেখায় কথ্য ভাষার গুণগান আপাতত সেই হাস্যকর প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু এ-গ্রন্থের সূচনায় দেখাতে চেয়েছিলুম যে ব্যক্তিমানব যখন আত্মজিজ্ঞাসায় মন দেয়, তখন সে যেহেতু বিশেষের সাড়া পায় না, শোনে ইতরের মর্মবাণী, তাই তার সঙ্গে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎ পরিচয় অবশ্যম্ভাবী ; এবং সেই জন্যে যে-ভাষা যথার্থই স্বকীয়—যার সাহায্যে নিজের কথা নিজের কাছে পৌঁছায়, তাতে সাধু সাহিত্যের কৃত্রিম শুদ্ধি অচল। তবে এ-সত্য আমি বারংবার ভুলেছি ; এবং আপনার মধ্যে সামান্যের উদ্বোধন প্রভূত পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে ব'লে, এক দিকে যেমন ভেবেছি যে নিভৃতে জনগণের নাম জপলেই, মোক্ষ আমাদের আয়ত্তে আসবে, তেমনই অন্য দিকে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারিনি যে প্রাকৃত আর যথাজাত এক ও অবিভাজ্য নয়।

তলিয়ে না দেখলে, এমন বিশ্বাসও বোধহয় পোষণীয় যে আমার সাহিত্যাদর্শে পাশ্চাত্য প্রভাবের আধিক্য দেশদ্রোহের সাক্ষ্য ; এবং এক অঙ্গকপ্পায়ীর বিচারে আমার স্থানাঙ্কবর্জিত পঙ্ক্তিরচনা, অদ্ভুত মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও, নিঃসংশয়ে ভরতবর্ষীয় বটে, কিন্তু আমার সংস্কৃতসম্বল গদ্যের গৌড়ী পদপাত বাংলার মাটি ছুলেও মাড়ায় না। উক্ত সূক্ষ্মদর্শীর রুচিতে ও বিবেচনায় আমার শ্রদ্ধা যদিও অসীম, তবু তাঁর অভিমতে আমি সায় দিতে পারিনি, বরঞ্চ ভেবেছি যে আমি বাঙালী ব'লেই, পশ্চিমের চিন্তাধারা আমার উপরে এতখানি সক্রিয় ; এবং বিগত শতাধিক বৎসরে বাংলার কৃতী সন্তানেরা ইংরেজী, তথা ইংরেজীর মারফতে য়ুরোপীয়, চিৎপ্রকর্ষের সঙ্গে যে-সম্পর্ক পাতিয়েছেন, তার তুলনা মেলে শুধু রোমক সাম্রাজ্যের সেই পর্যায়ে, যখন প্রত্যেক শিক্ষিত রোমান্ মাতৃভাষায় ও গ্রীকে ছিল সমান ব্যুৎপন্ন। কেবল তাই নয়, আর্যাবর্তের অতীত

গৌরবও ইংরেজ বিদ্বানদের আবিষ্কার ; এবং এ-কথা মানতে আজ আর আমার সংকোচ নেই যে স্বাধীন ভারতবর্ষের যে-সকল অভিলাষ সমাদরের যোগ্য, সে-সমস্তের অধিকাংশ ইংরেজী উদারনীতির ক্রমবিকাশ।

গ্রীসের সঙ্গে রোমের ভাষাগত সাদৃশ্য যদিও একেবারে নেই, তবু উভয়ের পৌরাণিক উত্তরাধিকারে, ও তজ্জনিত কুলকর্মে, বৈষম্যের চেয়ে মিল বেশী ; এবং বঙ্গদেশ ও শ্বেতদ্বীপের মধ্যে যেহেতু আদলের আভাসটুকুও অনুপস্থিত, তাই বাইবেল্-তর্জমার উপলক্ষে বাংলা গদ্যের জন্ম ইতিহাসের অন্যতম অঘটনসংঘটন। সম্ভবত সেই জন্যে বঙ্গীয় গদ্যের ধারায় পরিণামী প্রাণযাত্রার বহুলাঙ্গ জটিলতা নেই ; এবং আমার জ্যেষ্ঠেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মপ্রত্যয়ে মানুষ হয়ে, সারল্য আর তারল্যের সহজ সম্পর্কটা ধরতে পারেননি। কিন্তু বাঙালী পাঠকের প্রতি তাঁদের তীব্র তাচ্ছিল্য কদাচিৎ আমার ধাতে বসেনি ; এবং আমার গদ্যে আবর্তের আবিল সূত্রপাত গুরুনিন্দার যৌবনসুলভ প্রবৃত্তি থেকেই বটে, তাহলেও প্রথম সংস্করণে "স্বগত"-এর অপ্রত্যাশিত কাটতি দেখে আমি বুঝেছিলুম যে বাংলার মনীষা আসলে স্বভাবনিরপেক্ষ নয়। সম্প্রতি "সংবর্ত"-নামক আমার একখানা কবিতাসঙ্কলনের বিক্রিতেও সেই অনুমানের আর একটা সমর্থন পেয়েছি ; এবং ইতিমধ্যে আমার গজেন্দ্রগামী ভাবনা অনিশ্চয়ের জটাজালে এমনই জড়িয়ে পড়েছে যে এ-বইয়ের বহু প্রবন্ধ দুর্বোধ্য জেনেও আমি প্রতিকারে অক্ষম।

অবশ্য শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণবিভ্রাট, অপটু বাক্যবন্ধের দোষে অর্থের নিপাতন ইত্যাদির সংশোধন "স্বগত"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে নেহাৎ নগণ্য নয় ; এবং কোথাও কোথাও অদল-বদল আরও ব্যাপক। কিন্তু জোরালো কথাকে ঘোরালো ক'রে তোলার অভ্যাস পঁচিশ বছরের আত্মধিকারেও কাটেনি ; এবং তির্যক্ রীতির বিপদ এই যে তার ভঙ্গুর অঙ্গবিন্যাসে যোগ-বিয়োগের ভার সয় না, পরিবর্তনের ইঙ্গিতে সে অভিপ্রায়ের বোঝা ছত্রাকারে ছড়িয়ে, চলার পথে মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে আমার উৎকট গতি জ্ঞানত কোনও বিদেশীর পদানুসরণ থেকে উৎপন্ন নয় ; এবং শত চেষ্টায় বর্তমান লেখাগুলোর একটাকেও আমি ইংরেজী অনুবাদের ছকে ফেলতে পারিনি, যদিচ আমার কয়েকটা কবিতা অনুরূপ রূপান্তর

অল্পাধিক মেনেছে। সুতরাং আমার চিন্তাপ্রণালী অন্তত তাঁদের কাছে বঙ্গীয় লাগবে, যাঁদের অভিজ্ঞতায় ভাব ও ভাষা যমজ; এবং আমার কাব্য কদাচিৎ সার্বজনীন আবেগের প্রসাদ পেয়ে থাকলেও, আমার প্রবন্ধে ব্যক্তিস্বরূপের দ্বন্দ্বিমুখ ধারণা, আর্যসত্যের প্রতি নির্বোধ পক্ষপাত, এমনকি কবিদের বিষয়ে দুর্মর ভাববিলাস—এ-সমস্তের উদ্ভব স্বদেশী কৈবল্যের অনির্বচনীয় নির্বিরোধে।

অন্তত এই আমার বিশ্বাস; এবং আমার জন্মভূমিকে আমি ভালোবাসি ব'লেই, আমাদের জীবনযাত্রায় শ্রেয়োবোধের সার্বত্রিক অভাব আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় ঠেকে। সামান্য মূল্যজ্ঞানে দরিদ্র না হলে, বাংলার প্রথিতযশা লেখকেরাও প্রকাশ্য রচনার পরিমার্জনায় ঔদাসীন্য দেখাতেন না, অথবা আমি মূল কবিতা না লিখে, সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে হাত পাকাচ্ছি শুনে, পিতৃদেব প্রেরণার সদ্ব্যবহার-সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিতেন না; এবং সাহিত্যের বহিরাশ্রয়ে অনাস্থা এখানে কত বিস্তারিত, তার প্রমাণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একাধিক গদ্য কবিতা, যার সঙ্গে আমার মতো দু-চার জনকে উদ্দিষ্ট পোস্টকার্ডের পার্থক্য পঙ্‌ক্তি ভাঙার কারুকার্যে। অথচ নিছক কলাকৌশলে প্রাচীন ভারতের আনন্দ ছিল প্রচুর; এবং অজন্তা ও ইলোরা যে-অনুশীলনের পরাকাষ্ঠা, তার গুণেই দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত কাব্যও অদ্যাবধি পাঠ্য। তবে অগণিত শতাব্দীর পরাধীনতা যে পারদর্শীর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুণ ধরাবে, তাতে আশ্চর্যের অবকাশ নেই; এবং হিন্দুস্থানে আবার রাজা-প্রজার পরস্পরবিরোধী ধর্ম, তথা শাসকের সমাজে শাসিতের অনধিকার প্রবেশ অর্ধবিনিময়ের সম্ভাবনাটুকুও অবশিষ্ট রাখেনি।

দায়িত্বস্বীকার তো বটেই, বোধহয় কাণ্ডজ্ঞানও স্বাতন্ত্র্যের ঔরসজাত; এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রে জেঁকে বসেছিল কর্তার ইচ্ছা আর বর্ণাশ্রমের প্রত্যাদেশ। সে-অবস্থায় পুরুষকার যেমন জল্পনামাত্র, স্বকীয় জাড্যের ব্যপদেশ তেমনই অনাত্মীয়ের অনীহা বা অবজ্ঞা; এবং তার উপরে গুরুভক্তি ভর করলে, হয় বন্দনায়, নয় ভর্ৎসনায়, সমালোচনার বিকার অনিবার্য। তখন সাহিত্যের নিজস্ব রসাতলে যায়, প্রতিষ্ঠা পায় জীবনেতিহাসের কপোলকল্পিত ভাষ্য; এবং অতঃপর, যাঁদের কাছে দলের লোক ছাড়া বাকী

সকলে শত্রু নয়, তাঁরা সুদ্ধ লেখকের ব্যক্ত অভিপ্রায়কে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে, তাকে শাস্তি দেন, সে পাঠকবিশেষের অন্যায় আবদার মেটাতে পারেনি ব'লে। অবশ্য কলাকৈবল্য পশ্চিমেও এত অল্প দিন বেঁচেছিল যে অনেকের মতে ওই কর্মঠবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের অন্বয়ব্যতিরেক; এবং হিন্দুর বিশ্ববীক্ষা থেকে অদ্বিতীয়ের আত্মরক্ষা যেহেতু আবহমান কাল দুষ্কর, তাই ভারতবর্ষের কান্তবিদ্যা হয়তো এখনও ব্রহ্মাস্বাদের অন্যতম মার্গ। তৎসত্ত্বেও রসসৃষ্টির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, বরং বিপজ্জনক; এবং আরও অনিষ্টকর ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীভুক্ত কৈবল্যের জন্যে রাজশক্তির বিদূষণ।

শিল্পিশিরোমণি যামিনী রায়ের মুখে শুনেছি যে পৃথিবী, ভারতীয় আর অভারতীয়, মাত্র এই অংশদ্বয়ে বিভাজ্য; এবং অনলস একনিষ্ঠা থাকলে, প্রতিমানের অনটন ও প্রতিবেশের অনবধান যে ইষ্টলাভের প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর অমর চিত্রাবলী। কিন্তু ফলোদয় ভুলে স্বধর্মের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম, গীতা যাঁদের কণ্ঠস্থ, তাঁদের মধ্যেও আজ আর প্রচলিত নেই; এবং বোধহয় তাই বাংলার এক উদীয়মান আলেখ্যকার একদা আমাকে বলতে পেরেছিলেন যে প্রদর্শনীর বিশ-ত্রিশখানা ছবি তিনি এঁকেছেন দিন-দশেকের ভিতরে। অবশ্য প্রতিভার এ-রকম পর্যাপ্তি দেখে, হিংসার প্রকোপে জলা ছাড়া আমার মতো প্রকৃতিরূপণের গত্যন্তর নেই; এবং জগতে এমন মহাকবি এখনও অজাত যিনি ছিদ্রান্বেষীর ভয়ে সচরাচর মৌনী। তাহলেও সাম্প্রতিক ভারতে কেন কেবল বিরূপাক্ষেরা বেড়াতে আসেন, এ-প্রশ্নের সদুত্তর হয়তো ঔপনিবেশিক স্বার্থের পুনরুল্লেখে নেই, আছে যামিনী রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত মন্তব্যে; এবং তাঁর কাছে সে-মীমাংসার তাৎপর্য যদিও বিপরীত, তবু আমি মনে করি যে উপস্থিত যুগে একা আমরাই মর্যাদাবোধে বঞ্চিত।

বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লোকপ্রসিদ্ধ তিরস্কারও স্মরণীয়; এবং বাংলা ভুলে গেছে, অথচ ইংরেজী শেখেনি—এমন ইঙ্গ-বঙ্গ জীব এখনকার আবহে অভাবনীয় হলেও, ইদানীং সেই শ্রেণীর মানুষই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, যাদের কাছে প্রাচ্য বিদ্যা কিংবদন্তী আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবিকাসংগ্রহের অবান্তর উৎপাত। সুতরাং স্বাস্থ্যতত্ত্বের কলেজী বক্তৃতায় বীজাণুর বিভীষিকা

দেখিয়ে, বাড়িতে চরণামৃত খেতে আমরা আজও অভ্যস্ত ; এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অধিষ্ঠানের মনান্তর যখন আর ঢাকা যায় না, তখন ভারতীয় দর্শনবিশারদেরা আধ্যাত্মিক আর্যাবর্তের তুলনায় জড়বাদী পশ্চিমের অপকর্ষ ভজান ব্র্যাড্‌লী-প্রমুখ বৈনাশিকদের দোহাই মেনে। অর্থাৎ হিন্দুর বিবেক মন্ময় ; এবং জীবন্মুক্তেরা অন্তর্যামীর নিকটে সদাচারের যত প্রেরণাই পান না কেন, লোকাচারের উন্নয়নে তাঁরা স্বভাবত নিরুদ্যোগ। ফলত এখানে মধ্যপন্থার স্থান নেই ; এবং যাঁরা এই অহংসর্বস্ব দেশের পরিচালক, তাঁদের কপালে অকথ্য দুরুক্তি তো আছেই, এমনকি অপঘাতও অসম্ভব নয়। অন্ততঃপক্ষে গান্ধিহত্যা হিন্দুধর্মে বাধেনি ; এবং সে-ঘটনার আগেও রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে আমাদের সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব যে-পরিমাণ অবারিত, জাতিসংগঠন ততোধিক ব্যাহত।

সে যাই হোক, সৎসাহিত্যের নিকষ বাংলাদেশ শুধু আজ হারিয়ে ফেলেনি, কখনও হাতে পেয়েছিল কিনা সন্দেহ ; এবং এই পাণ্ডববর্জিত ভূভাগে জন্মেও যিনি শিল্পোৎকর্ষের ঐতিহ্য-সম্বন্ধে কৌতূহলী, তিনি সাগরলঙ্ঘনে বাধ্য। অতএব উপস্থিত গ্রন্থে বিজাতীয় লেখকদের উপস্থাপন অহৈতুক নয় ; এবং এখানে অর্বাচীনদের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত এই কারণে যে প্রাচীনদের আমরা যে-দৃষ্টিতে দেখি, তার অনেকখানি গতানুগতিক। অর্থাৎ অনুপূর্ব প্রশস্তির পাত্র নয় ব'লে, আধুনিকদের সম্পর্কেই সাহিত্যসংক্রান্ত মূলসূত্রাদির প্রতিগ্রহ আবশ্যক ; এবং সে-পরীক্ষায় তাঁদের কেউ কেউ রসোত্তীর্ণ নন বটে, কিন্তু সকলের বেলায় যে এক রকমের নিয়ম খাটে, তাঁদের বিষয়ে এটাই আসল কথা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের দৃষ্টান্তও আমাকে সৌন্দর্যসৃষ্টির উপায়, বা তত্ত্বমসির খণ্ডন, শেখায়নি ; এবং তবু আমি যেকালে লিখতে প্রস্তুত, তখন শিক্ষা নিশ্চয়ই সংস্কারের অনুগত। কিন্তু আমার অক্ষমতা যেমন প্রাতিস্বিক, তাঁদেরআদর্শ তেমনই নৈর্ব্যক্তিক; এবং কাব্যসাধনা তথা সমাজসেবার জন্যে একটা নিরপেক্ষ উপমানের প্রয়োজন। সেই উপমানের সন্ধানে আমার অগস্ত্যযাত্রা হয়তো একেবারে অনর্থক নয়।

তথাচ মহাপ্রস্থানের পথেই প্রত্যাবর্তন নেই : অন্যত্র যদি উপচিকীর্ষা প্রতিগামীর বাধ না সাধে, তবে আমরা তাকে উন্মার্গ বলতে বাধ্য ; এবং এত

প্রবন্ধের পরেও আমার হাত দিয়ে যেহেতু স্থায়ী কাব্য বেরোয় না, তাই আমি লজ্জিত বটে, কিন্তু আমি অনুতপ্ত আমার প্রাত্যহিক জীবনে মাহাত্ম্যের অধীত দেশনা আকারী ব'লে। তার মানে এমন নয় যে বয়স্থ হিন্দুদের মতো আমিও এ-বার পরকালের চিন্তায় প্রাণপাত করব : বরং উল্টো কথাই সত্য ; এবং দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি, তত বুঝছি যে সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল। তাহলেও আমার আর সন্দেহ নেই যে সজ্জন সৎকবির অগ্রগণ্য ; এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যের রচনা সুচরিতের সাধ্যে না কুলাক, কায়মনোবাক্যের অবৈকল্য-ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠ কবিতার উৎপাদন অসম্ভব। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা আর উৎকাঙ্ক্ষার অদ্বৈত যেমন সাধুর কর্তব্য, তেমনই কবির প্রতিপাদ্য নর্ম, কর্ম ও মর্মের একীভাব ; এবং সে-সমীকরণের উপক্রম পর্যন্ত যখন আমার কোথাও দর্শনীয় নয়, তখন শ্রেয়োবোধের মন্ত্রপাঠ আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা।

(সিগনেট প্রেস থেকে লেখকের আশুপ্রকাশ্য প্রবন্ধসংগ্রহ "স্বগত"-এর নূতন সংস্করণের জন্যে রচিত পরিশিষ্ট)

মহিলাকে : শিল্পীর উত্তর

সৈয়দ শামসুল হক

লোকোত্তর কোনো-এক গ্রহকীট, জ্ঞানী, দীর্ঘদিন
দর্শন, ভেষজ আর নীতিশাস্ত্রে ভ্রমণের পর
ঢেকে দিয়ে আলো নিজ পরিচ্ছদে, আনীত আঁধারে
সোনালি আপেল চেয়ে প্রার্থনায় করে উচ্চারণ।
একাকী অলিন্দে তার স্বগতোক্তি করে প্রদক্ষিণ ;
মনোগত বাসনাবিলাস জ্বলে যেন রাত্রিভর
প্রমিত প্রদীপ এক পুরাতন স্বর্ণদীপাধারে।
অন্তিমে প্রস্তাব তার অলৌকিক নারীর চুম্বন।

আমি তার উত্তরাধিকারী , অপাঙ্গে যোজনা করো
বিদ্রূপের শর, জনান্তিকে বলো, 'কেন সে-শিল্পীকে
হ'তে হবে অনাচারী, বৃত্তকাম, অসুস্থ, অনয় ?
কেন এ জরুরি, যদি পরিণামে সর্বনাশ জ্ঞাত ?'

পরিণামে সর্বনাশ ? হঠকারী যত মূর্খ মূঢ়
নিরূপণে সুতৎপর। কখনো কি ক্ষণিক সুপ্তিকে
অনন্ত প্রয়াণ বলো ? আনন্দ তো সেই সূর্যোদয়
রশ্মি যার হর্ম্যদেহে চিত্রাবলী করে প্রতিভাত।

নিত্যকাল আমারো অন্বেষা সেই আনন্দ-আকর,
অগম্য সম্ভোগে নয়, প্রেমিকার বিলোল মুদ্রায়।
সহজে উদ্ধত তাই আয়ু থেকে চব্বিশ বছর
এবং অনন্তকাল দুর্লভার চুম্বন-তৃষ্ণায়॥

দুটি কবিতা

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

ইস্কাবনের বিবি ও রোদ

এ-ক'দিন একটুও রোদ নেই। ডিনামাইট-বিধ্বস্ত নীল।
হাওয়া মেঘ বৃষ্টির বন
যুদ্ধক্ষেত্র ধোঁয়া আলো আরক্তিম বিস্ফোরণে ভরা,
ইস্কাবনের বিবি অন্ধকার আকাশ এখন।

আজ ভোরে আমার উঠোনে
খাতক প্রকৃতি-বৌ রাশীকৃত সোনার টুকরো গোনে
ঋণ শোধ দেবে ব'লে মহাজন পশু পাখি মানুষের ঘরে।
অনর্গল দুধ মধু দীপ্ত ফল ফুল অন্ন ঝরে—
আজ আমি রকফেলার-ফোর্ডের চেয়েও ধনী
এ-নারীর শান্ত সততায়,
আমার মোটর বাড়ি উজ্জ্বল আসবাব
ছড়ানো অগুন্তি নীলিমায়।

বিধ্বস্ত

কেউ মানে, কেউ তার নির্দেশ মানে না।
সন্ধ্যার স্তম্ভের মতো অন্তহীন মোটর-ক্রমির ব্যস্ততায়
সে রাখে জ্বালিয়ে তবু রক্ত-নীল আলো অন্ধকারে,
হে রূপসী, ফেরাতেই হবে মুখ শান্ত নীলিমায়।

এবার ফিরতে হবে। আতিথেয় পেয়ালায় অমৃত ভরেছি।
সুচতুর কারুকাজ কথায় লুকিয়ে সাপ হেসেছি মধুর :
আশৈশব বন্ধুকেও আচমকা পিঠে ছুরি মেরে
প্রেম কিংবা চাকরির লড়াই করেছি।

কোথায় চলেছ তুমি ? আলো নেই, অন্ধকার তবু
আকাশে এখনো আছে অমলিন তারার রোদ্দুর—
যেখানে কর্দমে কামে বাজনায় গুলজার নরক,
চমকায় না প্লাস্টিকের চুড়ি কিংবা দোয়েলের সুর
শান্ত ভোরে। ফিরে দেখবে ভেঙে গেলে সমস্ত কুহক,
বিধ্বস্ত বাড়িতে লেগে ছেঁড়া চুল, একফোঁটা সিঁদুর।

ভিলানেল

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।
রাত্রিশেষে ম্লান মেঘের প্রসাধনে
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি।

গোপন রেখে তবে এ-কথা কাকে বলি।
এ কার মায়ামুখ ভেবেছি মনে-মনে।
তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।

কেন যে মনে আসো কেন যে যাও চলি !
স্বপ্ন ছিঁড়ে ফের নতুন ক'রে বোনে
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি।

আকাশে জ্বালো তুমি তারার দীপাবলি।
স্পর্ধা আঁকো এই দীপ্ত যৌবনে।
তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।

ব্যাকুল বাসনার বেদনা নিয়ে জলি
হৃদয় নিয়ে একা, নিভৃত নির্জনে
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি।

এ কার আশা নিয়ে প্রাণের ভীরু কলি
পাপড়ি মেলে দেয় তবুও আনমনে।
তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি ॥

ব্যর্থতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

কী ক'রে তোমাকে ধ'রে রাখি ?

তোমার স্মৃতির আলো বুকে নিয়ে, পাখি
উড়ে যায় অকূল আকাশে।
বাতাসের ঝাঁক এসে বিষাক্ত নিশ্বাসে
মুছে নেয় অনুরাগে-রাঙা ছলোছলো
সে-দিনের পাণ্ডুলিপি। স্তরে-স্তরে ফুল
বাসি হয়। ছবি ছেঁড়ে। স্মৃতির পুতুল
ভেঙে যায়। ঘেরে মন শূন্যতার ফাঁকি।
কালের চক্রান্ত রুখে বলো, চন্দ্রা, বলো—
কী ক'রে তোমাকে ধ'রে রাখি ?

দুটি কবিতা

শামসুর রাহমান

যে-ছায়া আয়নায়

যে-ছায়া আয়নায় আঁকো সকাল-সন্ধ্যার অবসরে,
তাকে কেউ কোনোদিন বলে কি রূপসী অনুপমা ?
ভুলেও বলে না জানি কেউ তাকে রূপের আধার।
তোমার গালের কালো একটি তিলের বিনিময়ে
দেবে না বিলিয়ে কেউ অকাতরে সাম্রাজ্য বিশাল ;
অথবা তোমার জন্য ভাসবে না শত রণতরী ,
তোমার শিখায় জ্ব'লে পুড়ে ছাই হবে না কখনো
পুরোনো শহর কোনো—কোনোদিন হবে না কিছুই।

আক্ষেপ প্রচ্ছন্ন থাক, ক্ষমা করো এ-সত্যভাষণ।
জেনেছি স্মৃতির জাদু, কী দরকার মিথ্যাচারে ম'জে ?
যা-কিছু অর্পিত এই কবিতার সামান্য আধারে,
নিশ্চিন্ত এ নয় জানি প্রেমিকের উচ্ছ্বাস-প্রপাত।
অথচ তোমার মনে নিত্য যে-অনল উন্মীলিত,
তাকে চাই দ্বিধাহীন প্রাণের সংসারে প্রতিদিন।

অলোকসামান্য নয় লেখনী আমার, তুমি তাই
পারবে না কখনো এড়িয়ে যেতে কালের তিমির।
তাতে কী ? অন্তত ছিলে আমার নিভৃত অন্তর্লোকে
গানের মতোই ব্যাপ্ত চিরদিন : সে-ও তুচ্ছ নয়॥

সে

প্রেম তাকে করে না আকুল। উদয়াস্ত তার প্রাণে
একটি মরুর জ্বালা উন্মোচিত—যেন সে দুর্জ্ঞেয় কোনো যন্ত্রণার গানে

ধুলোর বিজনে যাত্রী মোহাবিষ্ট আর হলদে পাতার বালিশে
মাথা রেখে অভীষ্ট সহজ গাঢ় ঘুমে যায় মিশে
ক্লান্তির মন্থর শ্লোকে,

অভিভূত হঠাৎ কখনো
ফুলের পাপড়ির মতো আকাশকে বলে, 'ঐ শোনো
কার যেন বাঁশি বাজে, স্পন্দিত পৃথিবী !'—শুধু তার মনে হয়
কোথাও অলক্ষ্যে কোনো নিঃসঙ্গ ফলের মতো একটি হৃদয়
গ'ড়ে ওঠে। সারাক্ষণ ভাবনার কত ছায়া ঝরে :
সে কার স্পর্ধিত মাথা লোটে আজ ব্যথার পাথরে ?

সোনার শিকল পায়ে পারেনি পরাতে কেউ তার
ত্রিলোকের ত্রিসীমায়। একটি অরূপ নদী প্রাণে বয় যার,
সে যায় চলার ধ্যানে, জনহীন বনে সেও পথভ্রষ্ট, জানে সব দিক
নির্দয় কালোয় মাখা, তবু এক তৃষ্ণা তাকে করেছে পথিক।
এবং অভ্যাসবশে
উদাসীন সে-ই আসে ফিরে
সাতপুরুষের জীর্ণ ভিটের তিমিরে
মাঝে-মাঝে, আলোর দাক্ষিণ্য নেই, তবু কিছু তুলে নিতে বাসনার ফুল
পুরোনো পিদিম জ্বালে। মনে পড়ে ছিল কার কালো চুল সুগন্ধে আকুল।

সে জানে নিজের কিছু পরিচয়, জানে তার বয়েসি কপালে
ক্রটির তিলক কাটা, একা-একা তাই শুধু জ্বালে
ব্যথার আগুন মনে। কোনোদিন অপরের দীপ্ত গুণে, জয়ে
হয়নি অসূয়া-দীর্ণ, তারও চোখ রূপ খোঁজে অথচ আপন মুখ ভয়ে
কখনো দেখে না ভুলে। তাকে আর কে দেবে অভয় ?
একটি অরূপ নদী (জানে সে-ও) প্রাণে তার বয় ॥

স্থলতা

অশোকবিজয় রাহা

'লক্ষ্মীটি, শোনো,
কতবার বলেছি তোমাকে,
আর কথা নয়
এইবার চোখ বুজে শোও
একটু ঘুমোও !'—
মাথার বালিশটাকে একটুকু ঠিক করে দিই।

কী জানি কী ভেবে
এইবার কথা শোনে,
ছোট্ট খুকির মতো হেসে,
বলতেই চোখ বোজে।
জানি আমি, ভিতরে-ভিতরে
কত শ্রান্ত ও যে,
কাল রাত থেকে
এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে
সমস্ত দুপুর গেছে আজ,
এবার ঘুমোয় যদি।

তাই ভাবি, কী ক'রে কী হল !
এত বড়ো নিদারুণ ব্যাধি
কোথা থেকে এল ?
চারটি বছর
এখনো হয়নি পুরো
এরি মাঝে সব এলোমেলো।
খোকা এল, খোকা চ'লে গেল
তারপর দু'দিন যেতেই
এই অভিশাপ !

ঘুমিয়ে পড়েছে
শোনা যায় মৃদু নিশ্বাস
বুকটুকু ধুকপুক করে
পাখির বুকের মতো—
কী দুর্বল হয়েছে সুলতা !
সারাদিন কথা ব'লে-ব'লে
আরো শ্রান্ত হয়
কিছুতেই পারি না বোঝাতে
কী ক'রে বোঝাই ?—
কত স্বপ্ন, কত সাধ ছিল
কী ক'রে ও ভোলে ?

জেদ ক'রে কেন যে শেষটা
শিলঙেই এল !
কত স্মৃতি ছড়ানো এখানে,
এই তো সেবার
বিয়ের ক'দিন পরে এসেছি দু'জনে
জেল-রোডে লাল বাড়িটাতে,
স্বপ্নের মতন
কেটে গেছে দুটি মাস,
সকাল-বিকাল
বেড়িয়েছি একসাথে,
আঁকাবাঁকা লাল পথ বেয়ে
কোনোদিন গিয়েছি পাহাড়ে
কোনোদিন লেকে
কখনো-বা বিডন-বিশপে,
সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার
স্প্রেড-ঈগ্‌ল ফল্‌স—

কতদিন গিয়েছে সেখানে,
মাঝে-মাঝে পাইনের বনে
কী ক'রে হারিয়ে যেত
তারপর হঠাৎ কখন
পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে যেত তরতর ক'রে—
পাইনের ফাঁকে-ফাঁকে
আঁচল উড়ায়ে
খিলখিল হেসে
চঞ্চল ঝর্নার মতো ছুটে যেত পাথরে-পাথরে।

এই সে সুলতা
শুয়ে আছে বিছানায় মিশে
একমুঠো রুক্ষ-চুল ছড়ায়ে বালিশে
ছোটো মাথাটিকে
একপাশে একটু হেলিয়ে।

ঘুমোক, ঘুমোক
এই শান্তি ওর
কিছুক্ষণ ডুবে থাক ঘুমে
ভুলে থাক জীবনের স্মৃতি।

বাইরে তাকাই
হঠাৎ চমক ভাঙে
পাহাড়-চূড়ায়
শেষ সূর্য আগুন ছড়ায়।
জ্ব'লে ওঠে জানালার কাচ,
ঘর ভরে রক্তিম আভায়,
পর্দা, টেবিলক্লথ, গালিচা, কুশান

লাল হয়ে যায়—
লাল হয় বিছানা বালিশ,
তারি মাঝখানে
স্থলতার ক্ষীণ দেহ ভাসে—
মুহূর্তেই সব ভুলে যাই
অবাক বিস্ময়,
মনে হয় সুদূর আকাশে
রঙিন মেঘের কোলে সন্ধ্যা শুয়ে আছে।

বহুক্ষণ স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
ধীরে-ধীরে ছবি মুছে যায়।

টি ওলেট

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মরা ডালে আর কেন জালো তুমি রোশনাই ?
কৃতী নই আমি, ট্যাঁকে নেই কানাকড়ি।
এ-কথা জেনেও যদি আসো, আফশোস নাই।
মরা ডালে তুমি কেন তবু জালো রোশনাই !
কবি নই আমি সে-কথা কবুল করি।
তোমার জন্য মন টানে নাকো জ্যোছনায়।
তবু মরা ডালে বৃথা কেন জালো রোশনাই :
কৃতী নই আমি, ট্যাঁকে নেই কানাকড়ি॥

তিনটি কবিতা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

শোহিনী

শেষ রাতের পাৎলা পর্দা ছিঁড়ে
তুমি এলে বেরিয়ে
সহজ আলোয় ধোয়া শরীরে।

দু'হাতে শিউলি ছড়ালে
আমার অস্ফুট জাগরণে।
স্নিগ্ধ আয়ত চোখে রইলে চেয়ে
শিশির ঝরল অপরূপ গান হয়ে!

হীরে-পান্না-মেশা আলোয়
আমি যেন নেয়ে উঠলাম।

কচি পাতায় ভোর জাগল।

লগ্ন

আলো এখন গোলাপ হয়ে ফুটল
স্থির বিশ্বাসের প্রভায় মাথা বিকেলে
নীলিমার শান্তি নামল সোনালি ঘাসে।

দিনের দাহ মুছে এলে
গোধূলির লাবণ্য যেন বৃষ্টি হয়ে ঝরল।
তার নরম শব্দ
গানের রেশ হয়ে কাঁপল
আলোয় -হাসিতে-ভেজা এই লগ্নে।

ঢেউ

ব্যথা-নদীর ওপার থেকে
আমার গহন ঘুমে তুমি এলে
সৌরভ ছড়ালে মায়াময়।

ব্যাকুল, বাড়াই দুই হাত—
ঘুম নিয়ে স্বপ্ন পলাতক।
ঘুম-ছেঁড়া সে-রাত তোমারো
পত্রদূত এনেছে খবর।

দুটি কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা

বিপরীত দিকে তবু সমান করুণ মুখ শিবিরে সৈনিক।
রাত্রির তিমির ছিঁড়ে অনেক প্রার্থিত সেই আসেনি পথিক :
নিঃশব্দ তুষার পড়ে, নিধূম পরিখা পারে বিরতির আলো
প্রচ্ছন্ন আশার মতো ; বাকি সব অন্ধ নীল মৃত্যু হিম কালো।

মানবপুত্রের নয়। শতাব্দীর বাষ্প জমে অসংখ্য হৃদয়ে :
মুখোমুখি স্থাণে চেয়ে সমুদ্রের মতো দোলে দুঃখ মানবিক।

অন্য এক সমুদ্র

সবুজ ফিরোজা নীল উঠে যায় ক্রমে :
পিছনে রজতফেনা, বহুদূর বালিয়াড়ি আর এক ঝাউবন,
আন্দোলিত সারাক্ষণ।

অনন্ত প্রবহমান অলঙ্ঘ্য নিয়মে।
অতীত-ভবিষ্য নেই, বার্ধক্য-যৌবনহারা, শুধু এই বর্তমান :
তরঙ্গের সমতান।

সম্রাট সৈনিক ভিক্ষু মিলিত নির্ঘোষে।
শোকের উচ্ছ্বাসে মেশে দারুণ প্রসব-ব্যথা, শিল্পীর দুঃসহ দাহ :
এই স্রোত এ-প্রবাহ।

সগরসন্তান তবু সমুদ্র শোষেকে :
বনস্থলী গ্রাম আঁকে মরুভূমি মুছে। পরমাণু-বিচূর্ণিত মেঘ
সমুদ্রের আনে বেগ।

'ল্য ফ্লার দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

রাজহাঁস

উৎসর্গ : ভিক্তর উগো

[ট্রজান সেনাপতি হেক্টরের স্ত্রী আন্দ্রোমাকি, ট্রয় নগরীর ধ্বংসের পর আকিলিসের পুত্র পিরহস (Pyrrhus : নামান্তরে, Neoptolemus)-এর ভাগে পড়েন। পরে ট্রজান গণক হেলেনুস-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হোমরের 'হলিয়াডে' এই হেক্টর-পত্নী জায়া ও মাতার আদর্শরূপে অঙ্কিত হয়েছেন, ইউরিপিদিস-এর 'আন্দ্রোমাকি' নাটকের অভাগিনী নায়িকা তিনি, 'ট্রজান উইমেন' নাটকেও সবচেয়ে শোকাবহ দৃশ্যের অবলম্বন। এই কবিতায় তিনি নির্বাসিত ও নিপীড়িতের প্রতিভূ।—অনুবাদকের টীকা।]

আন্দ্রোমাকি, তোমাকে স্মরণ করি! সেই প্রস্রবণ,
যা তোমার বিশাল বৈধব্য-দশা বুকে নিয়ে, কবে
হয়েছিলো বিষাদে প্রদীপ্ত এক শোকের দর্পণ,
মিথ্যাচারী সিময়ীস,[১] পরিপ্লুত অশ্রুর গৌরবে,

তা ভেবে আকুল হ'লো সুপ্রসবী স্মৃতির মঞ্জরী
হঠাৎ, নূতনতর কারুজে্‌লে[২] পা দিয়ে সেদিন।
হায়, নেই পুরোনো প্যারিস আর (এ-মহানগরী
নিত্যপরিবর্তমান, হৃদয়ের চেয়েও স্বাধীন) ;

তবু মনে-মনে আমি দেখি সেই বিলুপ্ত আবাস,
সারি-সারি টালি-ছাদ, চুন-খসা কার্নিশ, দেয়াল,
নর্দমার শ্যাওলায় সবুজ কাঠ, মধ্যে ঘন ঘাস,
আর কত ইতস্তত জ'মে-ওঠা উজ্জ্বল জঞ্জাল।

১। সিময়ীস (Simois) : উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ক্ষুদ্র নদী, ট্রজান যুদ্ধের অনেক ঘটনার স্থান।
২। কারুজেল (Carrousel) : প্যারিসের পাড়া।

পশু, পাখি নিয়ে ছিলো খেলোয়াড়। আমি একদিন
ভোরবেলা, যখন হিমেল, স্বচ্ছ আকাশের তলে
জেগে ওঠে পরিশ্রম, আর শান্ত, শব্দহীন
বাতাসে তুফান তুলে তীব্র যান ছোটে দলে-দলে,

এখানে দেখেছিলাম, ফুটপাতে, এক রাজহাঁস,
খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া, জালি-পায়ে কষ্টে হেঁটে চলে
কঠিন জমিতে টেনে পালকের ধবল উচ্ছ্বাস।
নির্জলা নালার ধারে অভাগার চঞ্চুপুট খোলে,

গলিতে ধুলোর মধ্যে স্নান ক'রে, কাতর, অদ্ভুত,
প্রশ্ন করে—জন্মের লাবণ্য-হ্রদে উচ্ছল পরান—
"জল, কবে বৃষ্টি হবে? কবে তুমি জলবে, বিদ্যুৎ?"
আমি সে-দুঃখীরে দেখি, অরুন্তুদ, আশ্চর্য পুরাণ,

আকাশেরে লক্ষ্য ক'রে, ওভিদের[৩] নায়কের মতো
(ঐ নীল আকাশ, হৃদয়হীন, ব্যঙ্গপরায়ণ)
বাড়িয়ে কম্পিত গ্রীবা, কণ্ঠদেশ তৃষ্ণায় প্রহত,
যেন তিক্ত ভৎসনায় বিধাতারে করে সম্বোধন!

২

প্যারিস নূতন হোক! অবিকল আমার বিষাদ!
অচল হৃদয়ে সব স্মৃতি যেন পাষাণ-ফলক,
পুরাতন উপকণ্ঠ, পথ, ভারা, নূতন প্রাসাদ
হ'য়ে ওঠে সেখানে প্রণয়চিহ্ন, কঠিন রূপক।

৩। Ovid (Publius Ovidius Naso : খৃঃ-পূঃ ৪৩-খৃঃ-পঃ ১৮): লাতিন কবি ও রোমান নাগরিক, কিন্তু কোনো কারণে রোম থেকে নির্বাসিত হ'য়ে জীবনের শেষ দশ বছর কৃষ্ণ সাগরের তীরে অতি দুঃখে যাপন করেন। তাঁর কাব্য প্রধানত আদিরসাত্মক, কিন্তু নির্বাসনের বেদনারও বাহন। বোদলেয়ার-এর "অনুকম্পাহীন ত্রাস" কবিতাতেও তাঁর উল্লেখ আছে।

তাই, লুহ্‌বরের পথে, আমার স্মরণে করে দাবি
মরালের চিত্রকল্প, নির্বাসনে নির্বোধ, মহান,
উন্মাদের মতো ভঙ্গি, আর তার চিত্তে অফুরান
কোন এক বাসনার জ্বালা! তখন তোমারে ভাবি,

আন্দ্রোমাকি, দয়িতের বাহ্যচ্যুত, পাশব অভ্যাসে
পিরহুসের দৃপ্ত হাতে সমর্পিত, তুমি, পুনর্নবা,
আনন্দে আনত হ'লে শূন্যগর্ভ সমাধির পাশে;
হায়, হেলেন্নুস-জায়া, হেক্টরের সন্তপ্ত বিধবা!

আর ভাবি, কর্দমে আস্তীর্ণ পথে, কাফ্রি রমণীরে,
ক্ষুধিত, যন্ত্রণায় কৃশ, এই ব্যাপ্ত কুহেলি-দেয়াল
কাটাতে পারে না, তবু ক্লান্ত চোখে খোঁজে ফিরে-ফিরে
অপরূপ আফ্রিকার অপহৃত, অদৃশ্য তমাল;

ভাবি, কে হারালো তা-ই, কোনোদিন যা ফিরে পাবে না,
তৃষ্ণা কার মেটায় অশ্রুর ধারা, আর সহৃদয়
বাঘিনীর মতো দুঃখ স্তন্য দিয়ে শোধ করে দেনা;
মরন্ত ফুলের মতো ভিখারির বিশীর্ণ বিলয়!

অরণ্য আমার আত্মা, দীর্ণ ক'রে তার নির্বাসন
তূর্যনাদে বেজে ওঠে প্রাচীন স্মৃতির ব্যাকুলতা!
দূর দ্বীপে বিস্মৃত মাল্লার দল, ম্লান বন্দীগণ,
পরাজিত, ক্রীতদাস!···ভাবি আরো অনেকের কথা।

অলংকার

ফেলে দিলো বসন আমার প্রিয়া। আমার অদ্ভুত
খেয়ালের অর্থ বুঝে—সুলতানের সোহাগে গর্বিণী
সুন্দরী বাঁদির মতো—চন্দ্রহার, কেয়ূর, কিঙ্কিণী
(কিন্তু অন্য কিছু নয়) প'রে নিয়ে হ'লো সে প্রস্তুত।

ধাতু আর পাথরের লেলিহান এই পরিণয়
চঞ্চল নিক্কণ তুলে সে-পুলকে ডোবায় আমারে,
যার স্বাদ পেয়েছি কেবল সেই অকূল পাথারে
যেখানে ছড়িয়ে আছে দীপ্তি আর ধ্বনির অপ্রয়।

নিলো সে আমার কাম : তারপর, পালঙ্কবিতানে
এলিয়ে, ঈষৎ হেসে, তাকালো সে অলসনয়না।
সমুদ্রের মতো শান্ত, অতলান্ত আমার কামনা
ছুঁলো তার তুঙ্গ চূড়া জোয়ারের প্রবল উত্থানে।

বুঝে নিলো, পোষ-মানা বাঘিনীর চতুর কৌশলে
তার শ্লথ, স্বপ্নিল দেহের লাস্যে আমার আহ্লাদ ;
যে-ভঙ্গি যখনই বাছে, তা-ই পায় প্রখর আস্বাদ
শুভ্র, কূট, সরল, পিচ্ছিলে মেশা সহজ হিল্লোলে।

আমার তন্ময় চোখ, মগ্ন হ'য়ে মধুরের ধ্যানে,
স্বাখে, তার দ্যুতিময় কটিতট, জঠর, জঘন,
মরালপংক্তির মতো কম্পমান, কেলিপরায়ণ ;
উদর, স্তনযুগল, দ্রাক্ষাপুঞ্জ আমার উদ্যানে,

উঠে এলো, বাসনায় নাড়া দিয়ে, ডাকিনীর মতো
ভেঙে দিলো, যে-বিশ্রামে করেছিলো আমারে বিলীন
প্রেয়সী, প্রোজ্জ্বল, দূর, সিংহাসনে নিঃসঙ্গ আসীন ;
শান্তির মাধুরী তার আন্দোলনে হ'লো প্রতিহত।

শ্রোণীচক্রে তরঙ্গের ভঙ্গে হ'লো রূপান্তর তার ;
নিতম্বে সে আন্তিওপি[১], ক্ষীণ স্কন্ধে তরুণ বালক,
মিশে যায় বিপরীত ; আর তার রোমহর্ষ ত্বক
বাদামি, মসৃণ, স্নিগ্ধ—মনে হয় স্বর্গের সম্ভার।

নিবে গেলো মুমূর্ষু বাতির শিখা। কোমলনিস্বন
অগ্নিকুণ্ড একা জ্বলে অন্ধকার, স্তব্ধ নিরালায়,
যতবার দীর্ঘশ্বাসে লালিমার উদ্ভাস জ্বালায়
শোণিতে প্লাবিত করে গাত্র তার অ্যাম্বারবরন।

মরণের নৃত্য

উৎসর্গ : এর্নেস্ত ক্রিস্তফ

[এর্নেস্ত ক্রিস্তফ (Ernest Christophe : ১৮২৭-৯২) বোদলেয়ার-এর সমসাময়িক একজন ভাস্কর, তাঁর গড়া 'Dans Macabre' নামক নারী-কঙ্কালের মূর্তি এই কবিতার উৎসস্থল। মূর্তিটির বিষয়ে গুণগ্রাহী আলোচনা লিখতে গিয়ে বোদলেয়ার এই কবিতার প্রথম কয়েক স্তবক উদ্ধৃত করেন। মূর্তিটি বর্তমানে কোথায় আছে জানা যায় না।—অনুবাদকের টীকা।]

সপ্রাণ রমণী যেন, গর্ব যার রুমাল, দস্তানা,
বিরাট ফুলের তোড়া, বরতনু সচ্ছল, সন্নত,
উদাসীন মাদকতা, শ্লথ ভঙ্গি, আছে তার জানা,
ক্ষীণাঙ্গী, বেপথুমতী অতিবেল প্রমদার মতো।

নাচের আসরে কবে কে দেখেছে এমন তন্বীরে ?
রাগীর অপরিমাণে পরিস্ফীত তার গাত্রবাস,
আঁটো জুতো, কুসুমের মতো কান্ত, কঠিন জিঞ্জিরে,
পা বেঁধে, ফোটায় তার মদময় মূর্ছার বিলাস।

১। Antiope : গ্রীক পুরাণে বর্ণিত, Zeus-এর অন্যতম প্রণয়িণী।

কামুক ঝরনা যেন, আমোদিত শিলার ঘর্ষণে,
লেসে-বোনা গলবন্ধ কেলি করে বিলোল কণ্ঠায়,
সে যারে লুকোতে চায়, মৃত্যুরূপী সেই আকর্ষণে
বাঁচায় বিদ্রূপ থেকে শরমে শোভন উৎকণ্ঠায়।

নিবিড় নয়ন তার শূন্যময় তমসায় গড়া,
সুকুমার মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে, অতি মন্দ তালে
দোলে তার করোটির বেণীবন্ধে পুষ্পের পসরা।
আহা কী মাধুরী ঝরে শূন্যতারে উৎসবে সাজালে!

"ব্যঙ্গচিত্র!" বলে ওরা; রক্তেমাংসে আত্মনিবেদনে
আসক্ত, মাতাল হ'য়ে বোঝে না তো মূর্খের মিছিল
মানবিক রূপকল্পে নামহীন এই প্রসাধনে!
কঙ্কাল! আমার কাম তোমাতেই খুঁজে পায় মিল।

এলে কি জাগাতে ত্রাস জীবনের অবোধ উৎসবে
বিকট ভঙ্গিমা নিয়ে? না কি এক প্রাচীন, দুর্বার
লালসার অন্ধ তেজ অকস্মাৎ সঞ্জীবিত শবে
ভোগের ভৈরবীচক্রে ঠেলে নিয়ে এলো পুনর্বার?

প্রোজ্জ্বল দীপের দামে, গীতময় তীব্র বেহালায়
বিদ্রূপে বিলোল ঐ দুঃস্বপ্নেরে ভেবেছো, ঠেকাবে?
অথবা হৃদয়ে ভরা নরকের প্রদীপ্ত জ্বালায়
ডুবিয়ে দেবে কি এক অন্তহীন রতিমদস্রাবে?

অবিদ্যার নিকেতন, প্রমাদের অক্ষয় আধার,
শাশ্বত ভৃঙ্গারে যার ফুরায় না প্রস্থ পরিতাপ—
চেয়ে দেখি, খোপে-খোপে জাফরি-কাটা পাঁজরে তোমার
নূতন উৎসাহ নিয়ে কাৎরে ওঠে তৃপ্তিহীন সাপ।

আসলে, আমার ভয়, ভাবিনীর চঞ্চল বিলাস
যত না বিলোল করো, মিলবে না উচিত মজুরি;
এ-মর জগতে কে বা বোঝে ঐ গূঢ় পরিহাস?
কেবল বীরের ভোগ্য বীভৎসের গহন মাধুরী।

গহ্বর তোমার চক্ষু, ভীষণের ভাবনাবিহ্বল,
উগরে তোলে অপস্মার। বিকশিত বত্রিশ পাটিতে
চিরন্তন হাসিটিরে বিচক্ষণ নর্তকের দল
পারে না, হুঙ্কার বিনা, মুহূর্তের মনোযোগ দিতে।

অথচ, কেউ কি আছে, কঙ্কালেরে বাহুবন্ধে বেঁধে
কবরের উপচারে অতি যত্নে লালন করেনি?
গন্ধ, বেশ, অঙ্গরাগ ভ'রে আছে সে কোন সংবেদে?
বিতৃষ্ণার ভানে শুধু ধরা পড়ে বর্ধমান ঋণী।

নাসাহীন দেবদাসী[১], আকর্ষণে গম্ভানি অজেয়,
তুমি যাতে রাহুগ্রস্ত, সেই সব দাম্ভিক, বেহুঁশ
নর্তকেরে বলো, "ওরে, রং, তুলি, পাউডর সত্ত্বেও
তোরা সব মৃত্যুর দুর্গন্ধে-ভরা! শুষ্ক আন্তিনুস[২],

বার্নিশে রাঙানো শব, পরিজীর্ণ লাভিলেস[৩] ওরে,
নির্লোম বাবু ও বিবি, মৃগনাভি-মাখানো কঙ্কাল—
মরনের মহানৃত্য নিখিলেরে আন্দোলিত ক'রে
সকলেরে খুলে দেয় অজানার দূর চক্রবাল!

১। মূলে bayadere, যার অর্থ দক্ষিণভারতীয় নর্তকী। শব্দটির মূল আমি সন্ধান ক'রে পাইনি।

২। Antinous: গ্রীক: Antinoos রোমক সম্রাট হাড্রিয়ানের প্রিয়পাত্র রূপবান যুবক। এঁর অনেক প্রস্তরমূর্তির এখনো অস্তিত্ব আছে।

৩। Lovelace (উচ্চারণ: লাভিলেস): স্যামুয়েল রিচার্ডসন-এর "Clarissa Harlowe" উপন্যাসে এক লম্পট চরিত্র।

তুহিন সেন্-এর তট, দহ্যমান গঙ্গার পুলিন,
সর্বত্র খেলায় মাতে মরগণ, অথচ ভ্রূক্ষেপ নাই
বলভীর রক্ত দিয়ে—যেন কালো, হিংসুক সঙ্গিন—
হানা দেয় সর্বশেষ তূর্যনাদে দেবদূত-সেনা।

সকল সূর্যের তলে, সব দেশে, মৃত্যু নেয় দেখে
তোদের সঙ্ঘের ভঙ্গি, রে মানব, বিহ্বল নেশায়,
এবং, তোদেরই মতো, মাঝে-মাঝে মদগন্ধ মেখে
তোদের উন্মত্ত স্রোতে আপনার বিরূপ মেশায়।"

মিথ্যার প্রেম

অলস আদরিণী, যখন দেখি তোরে—
কণিত বেহালায় সীলিডে ভাঙে সুর,
চলার মুগ্ধ লয় ছন্দে বাঁধা পড়ে
নিবিড় নির্বেদে নয়ন ভারাতুর ;

গ্যাসের আলো, দেখি, সাজায় তোর ম্লান
ললাট যেন এক রোগের গহনায়,
সান্ধ্য বাতি আনে উষার অনুমান
ছবির মতো তোর চোখের মোহানায় ;

তখন ভাবি, "সে যে ফুল্ল, রূপবতী,
বিরাট স্মৃতি তার মুকুট মণি-জ্বলা,
আহত পাকা ফলে রতির পরিণতি,
তৈরি তনু তার শিখবে কামকলা।"

বল, হেমন্তের পরম ফল তুই ?
না, চিতাভস্মের অশ্রু-অভিলাষ ?
স্বপ্ন-উপাধান ? গন্ধভরা জুঁই ?
সুদূর মরুদুর ফুলের নির্যাস ?

আছে তো জানি চোখ বিষাদে ঘন-লীন,
অথচ নেই কোনো গোপন আকুলতা ;
খচিত পেটিকার গর্ভ মণিহীন—
কেবল নীলিমার গভীর শূন্যতা।

কিন্তু প্রতিভাস—তা-ই তো বরণীয়।
মৃত্যোশ হোক, আর মোহন প্রসাধন—
কী তাতে এসে যায় ? অনুতে মানি প্রিয়
ও তোর মায়ারূপ আমার আরাধন।

স্বীকারোক্তি

শুধু একবার তোমার বাহুর দ্যুতি
আমার বাহুতে করেছিলে বিন্যস্ত ;
মধুর মহিলা ! সেই ক্ষণিকের স্মৃতি
মনের তিমিরে এখনো যায়নি অস্ত।

গভীর প্রহর ; নতুন টাকার মতো
চাঁদ ঢেলে দেয় গম্ভীর মধুরিমা,
সুপ্ত প্যারিসে ঝরে অপ্রতিহত
বন্যার মতো উদ্বেল পূর্ণিমা।

পা টিপে, লুকিয়ে, বিড়ালের আসা-যাওয়া,
কান খাড়া ক'রে, ছায়ার অন্তরঙ্গ ;
ওরা যেন মৃত প্রিয়ের প্রেতচ্ছায়া
সন্তর্পণে চায় আমাদের সঙ্গ।

আলোর প্রহ্লন, অমল সে-বিনিময়ে
রম্য বীণার তুমি ছিলে বাণীমূর্তি,
অথবা স্বচ্ছ, প্রভাতের বিস্ময়ে
তূর্যনাদের উদার স্বতঃস্ফূর্তি ;

অথচ সহসা, তোমারি কণ্ঠ টুটে
(যা ছিলো সহজ পুলকে ঝলকে পূর্ণ)
তীব্র, দারুণ আর্তনিনাদ উঠে
সে-বৈকুণ্ঠে ক'রে দিয়ে গেলো চূর্ণ !—

জঘন্য শিশু, বিকট, অঙ্গহীন,
জন্মালো যেন কুলে কলঙ্ক মেখে,
যাকে রাখা চাই নেপথ্যে বহুদিন
অদর্শনীয়, গুপ্ত গুহায় ঢেকে।

হায় অপ্সরা, সেই কর্কশ ধ্বনি
শোনালো বার্তা : "প্রমিতিরিক্ত বিশ্ব !
প্রসাধনে যত হোক সে পরিশ্রমী
অহমিকাতেই মগ্ন নিখিলদৃশ্য ;

রূপসী নারীর ব্যবসা কঠিন অতি
গতানুগতির নিষ্ফল বাহুপাশে,
নর্তকী যেন, শীতল, বেতনবতী,
মূর্ছা গেলেও পুতুলের মতো হাসে ;

মূঢ় সে-জন, হৃদয়ে যে বাসা বাঁধে,
ক্ষণভঙ্গুর অনুরাগ, সৌন্দর্য—
সব জড়ো করে চিরন্তনের ফাঁদে
বিস্মরণের ক্ষমাহীন মাৎসর্য !"

আজো মনে পড়ে, শান্ত সে-অবকাশে
মৌন চাঁদের মায়াবী অভিব্যক্তি,
এবং ভীষণ, বর্বর বিশ্বাসে
হৃদয়ের সেই দুর্জয় স্বীকারোক্তি।

সৌন্দর্যের স্তব

উৎস কি তোর দ্যুলোক, অথবা পাতাল-তল ?
সুন্দর ! তুই অমৃতচক্ষে নরক জেলে
উপকার, পাপ, বিকার ছড়াস অনর্গল,
তাই তো মদের পাত্রেই তোর তুলনা মেলে।

উষার উদয়, অস্তভানুতে নয়ন ভরা ;
অধরভাণ্ড চুম্বনে ঢালে ওষধি-রস ;
অঙ্গসুবাসে ঝড়ের সন্ধ্যা রয়েছে ধরা,
বীরের বেপথু, এবং শিশুর দুঃসাহস।

উৎসব আর ধ্বংস বিলোস নির্বিচারে,
পরম কর্ত্রী ! কারো কাছে নেই জবাবদিহি !
মুগ্ধ নিয়তি, কুকুরের মতো, পিছু না ছাড়ে,
পাতালে, তারায়—বল ছিলি তুই কোথায় গৃহী ?

আতঙ্ক তোর মণিসঞ্চয়ে সংকলিত,
মৃতেরে মাড়িয়ে চ'লে যাস তুই গর্বভরে ;
এবং হত্যা, রতির প্রসাদে চঞ্চলিত,
পুতুলের মতো নিতম্বে তোর নৃত্য করে।

ক্ষণিকার পাখা তোর দীপালির সম্মোহনে
কাঁপে, জ্বলে, আর বলে, "এ-বহ্নি অমরাবতী !"
মুমূর্ষু যেন আপন চিতার আলিঙ্গনে,
বধূর অঙ্গে আনত তেমনি তরুণ পতি !

স্বর্গে অথবা নরকে জন্ম, কী এসে যায়,
ওরে সুন্দর, বিকট, সরল, দারুণ ত্রাস !—
যদি তুই—আমি ভালোবেসে যারে খুঁজি বৃথায়—
চোখের ঝলকে সেই অসীমেরে খুলে দেখাস !

অনন্ত্যা, তুই দেবী না ডাকিনী, কে আর ভাবে—
মখমল-চোখে অপরূপ তোর উজ্জ্বলতা
যদি করে লঘু, ছন্দে, গন্ধে, মদস্রাবে
নিখিলকালিমা, আর সময়ের মন্থরতা !

অনুকম্পায়ী ত্রাস

অস্থির, তোর ভবিতব্যের মতো,
এবং ভয়াল, পাংশু গগন-তল
তোর ও-শূন্যে নামায় অনবরত
সে কোন চিন্তা ? লম্পট, কথা বল !

—তৃষ্ণা আমার তৃপ্তি আজো না শেখে,
অনিশ্চয়ের আঁধারেই আনাগোনা,
বঞ্চিত হ'য়ে লাতিন স্বর্গ থেকে
ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না।

ছিন্ন আকাশে সৈকত অনুমান,
তোমাতেই দেখি আমার অহংকার ;
তোমার মেঘের বিষণ্ণতার ভার

সে যেন আমারি স্বপ্নের শবযান,
এবং তোমার রশ্মিতে তারি ভাষা
যে-নরকে আমি বেঁধেছি সুখের বাসা।

রুগ্ন কবিতা

আহা রে, কবিতা, বল, কোন ব্যাধি তোরে আজ দহে ?
নয়নকোটরে দেখি দলবদ্ধ নৈশ মতিভ্রম,
আর তোর গাত্রে খেলে, একান্তর, সমান আগ্রহে
মূঢ়, মূক অপস্মার, আতঙ্কের হিমেল বিক্রম।

এলো কি সবুজ প্রেত, কিংবা কোনো লোহিত প্রমথ,
কটাহমন্থনে তোর লালসার সন্ত্রাস জ্বালা তে ?
অথবা দুঃস্বপ্ন, এক বদ্ধমুষ্টি দানবের মতো,
তোরে কি ডুবিয়ে দিলো মিনটার্ন[১]-এর বিশ্রুত জলাতে ?

১। ফরাশি, Minturnes ; ইংরেজি, Minturne ; গ্রীক ও লাতিন, Minturnes : রোমের নিকটবর্তী জলাবহুল ক্ষুদ্র শহর ; রোমান যোদ্ধা Gaius Marius (খৃঃ-পূঃ ১৫৭-৮৬) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী Sulla (বা Sylla) কর্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে সেই জলার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় ধরা পড়েন। প্লিনি, হরেস, লিভি, সিসেরো প্রভৃতি লাতিন গ্রন্থকর্তারা বহুবার মিনটার্ন-এর জলার উল্লেখ করেছেন।

মনে হয় তোর বুকে ভাবনার গভীর উদ্ভাস
নিশ্বাসে বিলায় যদি একবার স্বাস্থ্যের সুবাস !
এবং সরল ছন্দে ঢেউ তুলে খৃষ্টান শোণিত

শিখে নেয় সেই দূর অতীতের দীপক-সংগীত,
যখন ছিলেন প্রভু, একান্তর এবং স্বরাট,
ফীবাস, গানের পিতা, আর প্যান্, শস্তের সম্রাট !

লিথি[১]

উঠে আয় আমার বুকে, নিঠুরা নিশ্চেতনা,
সোহাগী ব্যাঘ্রী আমার, মদালস জন্তু ওরে,
প্রগাঢ় কুন্তলে তোর ডুবিয়ে, ঘণ্টা ভ'রে,
চঞ্চল আঙুল আমার—হ'য়ে যাই অন্যমনা।

ঘাঘরায় গন্ধ ঝরে, ঝিমঝিম ছড়ায় মনে,
সেখানে কবর খোঁড়ে আমার এ-খিন্ন মাথা,
মৃত সব প্রণয় আমার, বাসি এক মালায় গাঁথা,
নিশ্বাস পূর্ণ করে কী মধুর আস্বাদনে !

ঘুমোতে চাই যে আমি, যে-ঘুমে ফুরোয় বাঁচা,
মরণের মতোই কোমল তন্দ্রায় অস্তগামী,
ক্ষমাহীন লক্ষ চুমোয় তনু তোর ঢাকবো আমি—
উজ্জ্বল তামার মতো ও-তনু, নতুন, কাঁচা।

শুধু তোর শয়ন-'পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয়,
খোলা ঐ খন্দে ডুবে কিছু বা শান্তি লোটে ;
বলীয়ান বিস্মরণে ভরা তোর দীপ্ত ঠোঁটে
অবিকল লিথির ধারা ব'য়ে যায় চুমোয়-চুমোয়।

১। Lethe : লাতিন কাব্যে বিস্মরণের নদী ; হিন্দু বৈতরণীর সঙ্গে তুলনীয়।

নিয়তির চাকায় বাঁধা, নিরুপায় বাধ্য আমি,
নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানীং ফুল্ল মালা ;
বাসনা তীব্র যত, যাতনার বাড়ায় জ্বালা—
সবিনয় হায় রে শহীদ, নির্মল নিরয়গামী !

এ-কঠিন তিক্ততারে ডোবাতে, করবো শোষণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়
ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়—
কোনোদিন অন্তরে যার হৃদয়ের হয়নি পোষণ।

কোনো মালাবারের মেয়েকে

তোমারই হাতের মতো সুকুমার তোমার পা দুটি ;
সুন্দরী শ্বেতার চোখে গুরুতর ঈর্ষার ভ্রূকুটি
জাগাও জঘন-ভঙ্গে ; শিল্পীর আদরে গড়া মধুর শরীর—
তারও চেয়ে তোমার মখমল-চোখ আরো কালো—বিশাল, গভীর।
সেই নীল আতপ্ত হাওয়ার দেশে, যেখানে বিধাতা
তোমাকে দিলেন জন্ম—কৌটো ভ'রে লঙ্কা, জিরে, তেজপাতা
তুলে রাখো, কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল, আয়েসি ভর্তার
কঙ্কিতে তামাক সাজো, ঠেকাও মশার হল্লা শয্যা থেকে, আর
যখন ভোরের গান ঝাউবনে ওঠে কেঁপে-কেঁপে
কিনে আনো সদ্য বাজার থেকে আনারস, পেঁপে।
সারাদিন স্বাধীন বেড়াও তুমি, খোলা পায়ে যেখানে-সেখানে,
গুনগুন করো কোন অচেনা, পুরোনো সুর বাতাসের কানে।
আর লাল সন্ধ্যার আঁচল যেই খ'সে পড়ে দূরে,
দাও গা এলিয়ে স্নেহে বারান্দায় নরম মাদুরে ;

আষাঢ় ১৩৬৩

ভেসে-চলা তোমার স্বপ্নের দল, পাখির কাকলি দিয়ে ভরা,
ছড়ায়, তোমারই মতো রমণীয়, ফুলন্ত পসরা।

হায় রে, দুলালী, কেন বেছে নিলি আমাদের এই
জনতাকাতর ফ্রান্স, যেখানে দুঃখের শেষ নেই?
কেন তোর আজন্মের আদরিণী তেঁতুলতলারে
বিশাল বিদায় দিয়ে, নাবিকের বাহুর বিস্তারে
সঁপে দিলি জীবন, যৌবন? কোনোদিন যদি পড়ে মনে—
পাৎলা মসলিনে কেঁপে শীত, শিলা, তুষারবর্ষণে—
দেখিস মধুর খেলা, ছেলেবেলা, আকাঙ্ক্ষার পটে,
তবুও চোখের জল ঠেলে রেখে, নিষ্ঠুর কর্সেটে
পিষ্ট স্তনে, ভিন্-দেশী অঙ্গের আঘ্রাণ ফেরি ক'রে,
অন্ন খুঁটে খেতে হবে প্যারিসের পঙ্কিল খর্পরে—
এদিকে, ময়লা, ছেঁড়া কুয়াশায় তোর পথ-চাওয়া
খোঁজে ক্ষীণ, সুদূর গুপুরিদের বিষণ্ণ প্রেতের মতো ছায়া।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪

মৈকালি লোক-সংগীত

(তেরিয়র এলউইন-এর ইংরেজি থেকে)

বিকাশ দাশ

১

যাচ্ছো তুমি অনেক দূরের দেশে—
ওগো মেয়ে, ওগো সোনার মেয়ে।
যাও না দিয়ে নীল কাঁচলখানি,
যাতে তুমি ঢাকো তোমার স্তন।
সকাল আর বিকেলে সারাক্ষণ
দু' চোখ মেলে দেখবো চুপচাপ!

২

তখন ছিলো দুপুর আর এখন নীল রাত,
মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে বলো মেয়ে
কোথায় তুমি চলেছো?—কেন একা?

৩

তামাক-খেতে মোরগ ঘোরে একা—
তেমনি করে হৃদয় পায়চারি
যখন তোমার পাই না আর দেখা!

৪

রাজা, তোমার জন্যে পাগল আমি,
হৃদয় পাগল এবং কেমন ভারি।
তুমি ছেড়ে গেছ ঘরের আরাম,
বাইরে কোথায় শয্যা পাবে গরম।
কোথায় গেলে আমায় ছেড়ে একা—
আমায় একাকিনী।

বাইরে কেবল থাকবে খেয়ে ফল,
এসো পাগল দু'জন চলো যাই,
দূর পাহাড়ে—নীল পাহাড়ে চলো।
সবুজ পাহাড় সবুজ,
হলদে বাঁশবন।
সবুজ ফুল, কালিন্দর লতা
চুলে আমার করন্দের ফুল।
কোথায় তোমায় খুঁজে পাবো, রাজা,
হৃদয় আমার পুড়ে হ'লো খাক্।
কোথায় তুমি, পাগল, আমার পাগল।

দিল্লির দৃশ্য

অর্চন দাশগুপ্ত

১

টু-সীটারে ঝড় আর মুহুর্মুহু স্পীডোমিটারের
অস্থির কাঁটাতে কাঁপে আশঙ্কার যান্ত্রিক নির্দেশ,
উইণ্ডস্ক্রীনের কাচে একটানা পাখার ঝাপটে
হাওয়ার চীৎকার : আজ অসম্ভব গীয়ার-বদল।

দু'ধারের দৃশ্যছবি রুদ্ধশ্বাসে পিছনে দৌড়োয় :
বিকেলের ক্লান্ত মাঠ, হাওয়ায় প্রগল্‌ভ ঘাস ফুল,
প্রবীণ পীপল গাছ, রুদ্ধ গ্রাম্য কুঁড়ের উঠোনে
মুরগিরা দানা খোঁটে, সসন্তানা শূকর-জননী,
ছাগলের পাল ফেরে, শুদ্ধ দুধে পুষ্ট বাঁট দোলে,
উজ্জ্বল টিয়ার ঝাঁক সদ্য-পাকা মকাইয়ের খেতে,
মরাইয়ের ম্লান টোকা ছায়া মেলে অবসন্ন রোদে,
জীর্ণ ইঁদারার পাশে মুগ্ধ চোখ আহীর মেয়ের।
পাশের অবাধ্য চুল গালে ঠেকে, পপি-র আঘ্রাণ :
উড়ে চলো, উড়ে চলো—সময়ের সীমা কতদূর॥

২

ঊর্ধ্বগতি তাপমান ; আকাশে বার্নিশ ;
মিনারে জলন্ত রোদ, পলেস্তারা-খসা
গম্বুজে ফাটল-ধরা শাহী মসজিদে,
বেনামি কবরে ; লু-তে থামের আড়ালে

স্থবির ফকির ; কোনো প্রাক্তন সরাইয়ে
খুঞ্চার বরফে রাখা কাটা তরবুজা,
আরক্ত খরমুজ, আখ ; ঘোলাটে ঠাণ্ডাই
মাটির খুরিতে ; ভিস্‌তি, উজ্জ্বল মশক্‌ ;
পিয়াউ, কাঁসার লোটা ; জয়পুরি কুঁজো
স্বেদাক্ত গাধার পিঠে ; খশখশের ঘ্রাণ।

(আন্দামান উপকূলে, বঙ্গোপসাগরে
বর্ষার সঞ্চার ইতি আবহপণ্ডিত !)

এখানে সূর্যের শিখা সোনালি হলুদ
ঝুলে-থাকা সোঁদালের চীনে-লণ্ঠনে ॥

দুটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

জানলা

দূরের খাদে তারার কুয়াশা
তুমি আমার পাশে,
একা পাইন আপন-ঠিকানিয়া
বিষণ্ণ নিশ্বাসে।

টিয়া-টিলায় কতকালের ছায়া,
উপত্যকা চূড়োর মুখোমুখি—
ঐখেনে, কাল ঝক্‌মকে রোদ হ'লে
শতদ্রুর উঁকি ॥

ভ্রষ্ট প্রেম

সে এসে দাঁড়ায় বুঝি আকাশের মতো,
তবু, স্থির, আলোয় আনত
শরীরে কোথাও আমি চামেলি কি জুঁই
রাখি না কিছুই ;

সে যদি হাওয়ায় সরে, জলে ভেসে যায়,
দাবানলে পোড়ে—
তার মৃতদেহে, নাকি স্মৃতির শরীর
ভীরু হাতে, চুপিচুপি ছুঁই ॥

পূর্বরাগ

দুর্গাদাস সরকার

দু বেলা দু দণ্ড দেখি। বাইরের খোলা বারান্দায়
যখন দাঁড়ায়—সূর্য বিস্ময়ে থামায় তার গতি,
নিস্তব্ধ দিগন্ত তাকে নীপবনে স্বাগত জানায়।
অনবগুণ্ঠিত তার চোখে মুখে আশ্চর্য সংগতি,
যৌবনে অবনীজয়ী, এ-জীবনে পরম নির্ভর।
ললিত কণ্ঠের তার ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
যেদিন বৈকালে বাজে—সে-রাগের সাগরে হারাই,
আড়ালে নিকটে যাই। ভাবি, হবে আলাপচারিণী
যখন থামাবে গান। তবু ফিরে করেছি খোদাই
অক্ষরে আস্তীর্ণ ক'রে তার নাম প্রতিটি প্রহর।

কী ভাবে যে কথা বলি। লেখা কথা বলাই কঠিন।
সতৃষ্ণ চোখে সে চায়। স্মিত মুখ নামায় কৌতুকে
গোপনে লালন করে বুকে কথা। আনে না তা মুখে
লজ্জায়, জড়ায় সে যে আমার চিন্তায় অহর্দিন।
আমাকে দেখলে তার ভুল হয় গান। শুধু ঝরে
না-বলার কথার সিন্ধু বিন্দু-বিন্দু তার কণ্ঠস্বরে।

তিনটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

প্রেমিকের গান : ১

কী এসে যায়, হও না তুমি হৃদয়হীনা—
আমার প্রেম দুই হৃদয়ের সমান বড়ো ;
লাস্য হেনে যত আমায় মাতাল করো,
শুধাবো না, সত্যি ভালোবাসো কিনা।

বরং তোমার কঠিনতায় পুলক লাগে
যখন দেখি নিখিল জুড়ে নাস্তি আশা,
অথচ ধীর ছন্দে আমার ভালোবাসা
ধূসর সব বছর মাখে রক্তরাগে।

কিন্তু যদি সম্ভাবনা অবাস্তব,
তাহ'লে প্রাণ শান্তিহীন কিসের টানে ?
নয় কি অনাগতেই ইতিহাসের চাবি ?

মেঘলা দিনের অন্ধকার তাই তো ভাবি—
একটিবারও ঘটলো যদি অসম্ভব,
আবার বামন ফেলবে না পা, কেউ কি জানে !

প্রেমিকের গান : ২

কাছে যাওয়া বড্ড বেশি হবে,
এই এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ভালো ;
তোমার ঘরে থমকে আছে দুপুর,
বারান্দাতে বিকেল প'ড়ে এলো।

মধ্যিখানে পরদা নাড়ে হাওয়া
অলির মতো ফুলের অবসরে,
গন্ধভরা তন্দুর মাদকতা
সম্ভাবনার প্রান্তে খেলা করে।
কিন্তু আমি চোখ ফিরিয়ে দেখি,
ক্যালেণ্ডারে বছর উড়ু-উড়ু,
তুচ্ছ দুটো শালিখ নেচে বেড়ায়—
এবং শুনি বুকের দুরুদুরু।
শুনি আপন বুকের দুরুদুরু,
সেখানে এক মস্ত আগন্তুক
রক্তকণায় তুলেছে তোলপাড়—
সেইটুকুতেই সুখ, আমার সুখ।

কথা বলা বড্ড বেশি হবে,
থাকো আমার চোখের দাবদাহ,
লক্ষ শিখার স্বপ্নে যেমন জ্বলে
অস্বাভাবিক নিথর খাজুরাহো।
শান্ত দুটি বাহুর অভিযান
আলিঙ্গনের প্রকাণ্ড এক বনে,
ঠোঁটে তোমার দীপ্ত কমণ্ডলু
উপচে পড়ে বিদ্যুতে চুম্বনে।
কিন্তু আমি মুগ্ধ হ'য়ে দেখি
তোমার পিছে জানলা আছে খোলা
আকাশ, তারা, দিগন্তেরে নিয়ে—
এবং শুনি অনন্তের দোলা।

শুনি অতল জলরাশির দোলা
যেখানে জড়—অন্ধ, অনিচ্ছুক—
বাধ্য তোমার সৃষ্টি করার কাজে—
তাতেই ভরে বুক, আমার বুক।

এক তরুণ কবিকে

পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি রেখো কড়া,
ছাঁটা চুলে যত্নে এঁকো টেরি,
লোকে দেখে ভাবুক, 'আমাদেরি!'
নয়তো ঝড়ে ছিঁড়বে দড়িদড়া।

সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া :
আক্রমণ, কাফের করতালি,
অবসাদের মলিন জোড়াতালি—
চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া

ঢাল-তলোয়ার আর কী তোমার আছে,
যত্নে যার বানের জলেও বাঁচে
ভ্রূণের মতো, অকথ্য সেই আগুন ?

আর তাছাড়া, সত্যি যদি উদ্গুন
রাঙিয়ে তোলে নিশ্বাসের হাওয়া—
আর কেন বা বিজ্ঞাপনের ধোঁয়া!

আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা

জ্যোতির্ময় দত্ত

স্বগত : সুকুমার রায়। কাহিনী। আড়াই টাকা
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা : প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্যভবন। দেড় টাকা
তৃতীয় নয়ন : পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। দু টাকা
লগ্ন গোধূলি : রবীন্দ্র বিশ্বাস। বিকল্প সাহিত্য ভবন। দু টাকা
মুস্কিল আসান : দিলীপ রায়। জিজ্ঞাসা। দেড় টাকা
দক্ষিণ নায়ক : অরবিন্দ গুহ। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। দু টাকা
হেমন্তের দিন : রাজলক্ষ্মী দেবী। অভ্যুদয় প্রকাশমন্দির। দেড় টাকা

আমার প্রবন্ধের আলোচ্য এই সাতজন কবি প্রমাণ করেন যে আধুনিক বাংলা কবিতার বয়স অনেক হ'লেও এখনো স্বভাবচরিত্র বিশেষ বদলায়নি। আজকালকার কবিরা সাধারণত খুব নিপুণ : এ-কথা বহুবার শুনেছি এবং হয়তো নিতান্ত মিথ্যে নয়। জীবনানন্দ তরুণ বয়সে যে-সব বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতেন, কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অথবা প্রবীণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ, তাও অনেকে ছেলেবেলার অনেক অভ্যাসের মতো ত্যাগ করেছেন, এবং অনেকেই শব্দচয়নে জীবনানন্দের অল্প বয়সের (এমন কি শেষ বয়সেরও) লেখার চেয়ে পটুত্বের পরিচয় বেশি দেন। কিন্তু আসল চরিত্র বিশেষ বদলায়নি। কবিতায় ভাষার ব্যবহারের পরিবর্তনে কবিতার সত্য পরিবর্তন সূচিত হয়। আমার ধারণা সে-পরিবর্তন বাংলা কবিতায় আসেনি।

প্রত্যেক কবিকেই কোনো-না-কোনো সময়ে নিজের ও সমাজের কাছে নিজের শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জবাবদিহি দিতে হয়। এবং খুব স্থিতিশীল সময়ের ক্ল্যাসিকাল সমাজবাসী কবিরা ছাড়া অন্য প্রত্যেকের নিজের স্বপক্ষে একটিই মাত্র ওজুহাত আছে : সেটি এই যে তিনি ভাষাব্যবহারে কোনো অপূর্বতা, একটি নতুন বাচনভঙ্গি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

কবিতায় ভাষাই অর্থের জনয়িত্রী। নতুন ভাষাবোধ বিনা নতুন অর্থের প্রকাশ সম্ভব নয়। যখন কবিতায় প্রগতি না থাক পরিবর্তন আছে, তখন ভাষার ব্যবহারে পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং কাম্য।

যুবকেরা অবশ্য ঔদ্ধত্যের বশে, পরিবর্তনের জৌলুসে ভুলে দূরে যাওয়ার ইচ্ছেয় ঐতিহ্যের সব উত্তরাধিকার ফেলে দিয়ে পাড়ি জমাতে চান। অন্যেরা শুধু বিষয়ের পরিবর্তনেই ভাবেন দ্রাঘিমা বদলালো, নতুন দেশে এসে গেলেন। আর অনেকে দূরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলবার ভয়ে যাত্রার আগেই কোনো কল্পিত কিংবা লুপ্ত স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তন করতে চান, কিংবা সমান নিশ্চিন্ততা লাভ করেন শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক চেতনায় লুপ্ত হ'য়ে।

এ-যুগের তরুণরা প্রায় প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ততা কামনা করেন। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। পাশ্চাত্ত্য দেশে আধুনিক শিল্প ব্যক্তিমানসের জটিল অলিগলি ঘুরে যেন অপ্রকাশের সীমান্তে এসে থমকে আছে। এবং বাণিজ্য-বিহীন নীরব দ্বীপে নির্বাসন যখন, আর যার পক্ষেই হোক, শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন প্রকাশের নতুনতর পথ খুঁজতে প্রত্যেকেই ব্যগ্র। সেজন্য অনেকে সহজবোধ্য হওয়ার আশায় কবিতায় বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যের বদল করেছেন, জন-গণেশের কিংবা ওয়েলফেয়ার-স্টেটের বন্দনা গাইছেন। কিন্তু পূর্ব-নির্ধারিত বক্তব্যের সুচারু প্রকাশ কবিতা নয়। শিল্পের বক্তব্য শুধু শিল্পের মধ্যেই মূর্ত, শুধু শিল্পকর্মের পরিধির মধ্যেই সেই শিল্পের অর্থের বিকাশ। সুতরাং নতুন অর্থ যদি সৃষ্টি করতে হয় তবে ভাষার নবজন্মও প্রয়োজন। এমন ভাষা, যা সেই অর্থটি সৃষ্টি করবে, কোনো পূর্ব-জ্ঞাত কিংবা পূর্বজাত তথ্যের সুপরিবেশনই করবে না।

২

আমার হয়তো প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেয়া উচিত যে আলোচ্য বই ক'টি পড়বার আগে থেকেই আমাকে কয়েকটি কল্পিত আশা ও আশঙ্কা বিব্রত করেছে। প্রত্যেকটি বই অল্পবয়সী কবিদের লেখা—নিজেরাই যাঁরা নিজেদের "তরুণতর" ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। সুতরাং ভেবেছিলাম এ দের কবিতা হবে তারুণ্য না হোক ছেলেমানুষিতে ভরা ; বয়সোচিত স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য

ও ভুল প্রত্যেক পাতায় লক্ষ্য করবো, প্রচলিত ধারণাগুলিকে তাঁরা বার-বার প্রশ্ন করবেন, একটুও স্বস্তি দেবেন না কখনো। এবং অপরিণতির ভুল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্বলক্ষণ হ'য়ে দেখা দেবে; সময়, অধ্যবসায়, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা এই ভুলগুলিকে পরিণত কীর্তিতে রূপান্তরিত করবে।

কবিতাগুলি পড়বার পরও বিব্রত বোধ করছি, কিন্তু অন্য কারণে। পূর্বগামীদের আধুনিকতার বদলে এঁরা নতুন কোনো আধুনিকতা আনেননি, তাঁদের ভাষাচেতনার বদলে নতুন কোনো চেতনার জন্ম দেননি; এঁদের কবিতার ধারণা জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দে-র ধারণা থেকে স্বতন্ত্র নয়। দুঃসাহসিকতা এবং বয়সোচিত বিদ্রোহের বদলে এঁরা সামাজিক ছাঁদ নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। এঁরা জন্মাবার আগে থেকেই যেন প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

প্রথমে মনে হ'তে পারে এতে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। বিদ্রোহের ইন্ধন হ'য়ে জ্ব'লে ফুরিয়ে না গিয়ে প্রথম থেকেই এঁরা প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন। ইওরোপ ও আমেরিকায় এ-রকম হাওয়া-বদল ঘটেছে; এর অস্পষ্ট আভাস বাংলা কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের মতো পাশ্চাত্য দেশেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন পর থেকেই, অনেক ব্যক্তির চিন্তায় লক্ষ্য করা যায় দেশজ ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা, সামাজিক হবার ও লোক-সাধারণের চৈতন্যে প্রবেশ করার প্রয়াস।

উনিশ শতকের ইওরোপীয়ের কাছে পাশ্চাত্য শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্প ছিল না, যেমন পাশ্চাত্য দর্শন কিংবা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সভ্যতাও তাঁরা কল্পনা করতে পারতেন না। অপর সংস্কৃতি বিষয়ে চেতনা বিশ শতকের একটি প্রধানতম লক্ষণ। টয়েনবী, মালরো-তে তা যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপে দেখা দিয়েছে, তেমনি পিকাসো বা এজরা পাউণ্ডেও তা মূর্ত। এবং এই অপর সংস্কৃতিসমূহের অস্তিত্বের চেতনা প্রত্যেক সংস্কৃতির আভ্যন্তরীন চেতনার রূপও বদলে দিয়েছে। আজ কোনো দেশের ঐতিহ্যই সরল রেখায় বিধৃত নয়; দেশাতীত ও কালাতীত শিল্পের জ্ঞান সমকালীন দেশীয় শিল্পের মূল্যায়নে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

অথচ এ-যুগের কবিদের প্রত্যেকে অদ্ভুতরকম বিদেশবিমুখ। তাঁদের

মধ্যে সমস্ত যুগ ও সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় ক'রে নিজেদের কাব্যচর্চার আদর্শ-সন্ধানের উৎসাহ প্রায় দেখাই যায় না। বাংলাদেশে যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে শুধু ইংলণ্ড নয়, ইওরোপের প্রধান-প্রধান কবিদের রচনা অনুবাদ ক'রে সারা ইওরোপকে আমাদের ঘরানা ক'রে তুলছেন, তখন বিস্মিত হ'য়ে আবিষ্কার করি আমার সমবয়সীরা ইয়েটস কি এলিয়টের সবচেয়ে কাঁচা লেখা বেছে নিয়ে "অনসূয়া-বিজয়া সংবাদ" কিংবা "La figlia che piange"-এর অনুবাদ করছেন।

এতে দুঃখিত হবার কারণ থাকলেও বিস্মিত হবার কারণ হয়তো নেই। ঠিক যেমন এই প্রতিষ্ঠিত কবিদের দ্বারা অনূদিত কবিতা ও কবিদের বদলে অন্য কোনো বিদেশী কবি কিংবা কবিতার যুগ আমরা নতুন ক'রে খুঁজে পাইনি, ঠিক তেমনি নিজের দেশের কোনো কবি কিংবা যুগও আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা। এবং তার কারণ, এঁদের কাব্যাদর্শের বদলে আমরা নিজেদের হ'য়ে কোনো নতুন শিল্পধারণার জন্ম দিইনি। বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্র দত্তর আধুনিকতা হয়তো আমার বয়সের কবিদের কাছে এখনো অত্যাধুনিক। শিল্পে এখনো আমরা হয় "সমাজবাদী" নয় "আনন্দবাদী"।

নতুন শিল্প-ধারণার বদলে আমরা এনেছি কবিতার বিষয়ান্তর ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যের পরিবর্তন। আমরা প্রত্যেকে আজকাল এক কল্পিত "সুস্থ জীবন-বোধে" বিশ্বাসী। এবং সেই সুস্থ জীবনবোধ যেহেতু সভ্য, ব্যক্তিসচেতন বুদ্ধি-জীবীর মধ্যে প্রাপ্তব্য নয়, তাই আমরা অগত্যা লোকসাধারণের চৈতন্যে ফিরে যেতে চাই। আর তারই ফলে আমরা মনে করি যেন লোকশিল্পের আদর্শ মেনে নিলেই সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সবচেয়ে উঁচুতে পৌঁছতে পারবো। সেইজন্য ছড়া ও বাউল ভঙ্গিতে লেখার ('মাটি, আমার মাটি। তুমি সোনার চাইতে খাঁটি') রেওয়াজ আজকাল ব্যাপক। আমাদের গোপন বিশ্বাস, সভ্য এবং ব্যক্তিসচেতন হওয়া কোনো অনির্দেশ্য কারণে যেন জনসাধারণের প্রতি "জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা"।

কবিতার বক্তব্যের পরিবর্তন নতুন শিল্প-ধারণা ছাড়া আসে না। কিন্তু আমরা এমন এক সময়ে লিখতে শুরু করেছি যখন আধুনিকতা আর আধুনিক নয়। শিল্পের ও ভাষার যে-ধারণা মালার্মে, এমন কি ভালেরির কালেও বৈপ্লবিক

ছিলো আজ তা কাফে ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে এসেছে। আধুনিক শিল্পের মূল ধারণাগুলি এখন ক্লিশে-তে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিতার যে-ধারণার দুই দিক মূর্ত করেছেন, আমাদের ভাষাচেতনা যেন সেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ভাষাব্যবহারের ধারণা যেন চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, এর পর যেন আমরা বক্তব্যের বিষয়ান্তর করতে পারি, ভঙ্গির ("new criticism"-এর ভাষায় যাকে বলে strategy) পরিবর্তনও হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু ভাষার ধারণায় কোনো মৌল পরিবর্তন আনতে পারি না, শুধু ছন্দসূত্র, এবং রুচির অলিখিত নির্দেশ আরো বেশি যত্নের ও একাগ্রতার সঙ্গে পালন করি। তাই কবিতা লেখা আজকে অনেক বেশি সহজ ও কঠিন। সহজ, কারণ যে-কোনো রুচিবান ব্যক্তিই কয়েকটি বাঁধা গতে বাঁধা চিত্রকল্পের সাহায্যে ("ফোলাবুক সাদা-সাদা হাঁসের মতন", "আসন্ন মহাবিশ্বের মহামানবের এক অপরাজেয় মিছিল", "নদীকে এলাম দিতে ভাঙা মন, মাটিরাঙা জল। এ-হৃদয় নিয়ে যদি ছিনিমিনি খেলে তো খেলুক") খুব অস্বচ্ছ ভাষায় লিখে কবিতা ব'লে প্রকাশ করতে পারেন। কঠিন, কারণ এটা অধ্যবসায়সাপেক্ষ, এবং আধুনিক কবি, প্রকরণের যে-দিকটির মাপজোক করা চলে সেই দিকে অর্থাৎ ছন্দ সম্পর্কে বেশ সচেতন। আলোচ্য বই ক'টির ছন্দ ও অন্য কয়েকটি বিষয়ের নৈপুণ্য আমাকে মুগ্ধ করে। দুঃখের বিষয় ভালো কবিতা আজ আর শুধু নৈপুণ্য দ্বারা রচনা করা যায় না, কবিতার নতুন সংজ্ঞাও সেই সঙ্গে কবিকে জোগাতে হবে। আমার আশঙ্কা হয়, পূর্ব-নির্ধারিত বক্তব্যের চাপে শিল্পের নতুন রূপ আবিষ্কারের সাহস এঁদের লুপ্ত হয়েছে ; বিদেশবিমুখ ব'লে দেশীয় ঐতিহ্যকেও এঁরা যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারছেন না এবং কাল্পনিক জীবনবোধ ও জর্মান রোমান্টিক ধারণা এঁদের নিজেদের দিকে ভালো ক'রে তাকাবার ক্ষমতা নষ্ট করেছে। কী হওয়া উচিত সেই চিন্তায়, শিল্পী হিসেবে এঁদের যে-একমাত্র নীতি থাকা উচিত, যে-কোনো প্রলোভনেই সত্যের স্বরূপ আবিষ্কারে বিরত না-হবার যে-নীতি, তা থেকে এঁরা ভ্রষ্ট হয়েছেন।

৩

"স্বগত"র কবি সুকুমার রায়ের নামগৌরব আছে। কিন্তু সে-গৌরব ধার-করা ব'লে তাঁর পক্ষে তা পরিহার্য ছিলো, নিজের নামটির না হোক, অন্তত বইটির। বইটির চব্বিশটি কবিতার মধ্যে তিনটি হ'লো বিদেশী কবিতার অনুবাদ। ডব্লিউ. জি. আর্চারের কোনো লেখা আমি ইতিপূর্বে পড়িনি ; যদি তাঁর অন্য সব কবিতা অনূদিত কবিতাটির তুল্য হয় তবে তিনি একজন অতি সাধারণ কবি। কামিংস বড়ো কবি নন, কিন্তু যে-কবিতাটি অনূদিত হয়েছে সেটি বোধ হয় তাঁকেও পীড়া দেয়। এবং এলিয়টের যে-কবিতাটি অনুবাদ করা হয়েছে সেটি হ'লো "দি লাভ-সং অব আলফ্রেড প্রুফ্রক"র একমাত্র কবিতা, যা সেকালের এডওয়ার্ডীয় পাঠকদের কাছে কিছুটা সমাদর লাভ করেছিলো।

এগুলি হ'লো সুকুমার রায়ের কাব্যাদর্শ অন্বেষণের একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত। তিনি যে সজীব, দেশে ও বিদেশে তাঁর কবিতার মূলের সন্ধান করতে চান, তা নিশ্চিত। কিন্তু ভয় হয় তাঁর অনুসন্ধান বিপথগামী। তাঁর কবিতায়, বিশেষত "কবিতা"য় প্রকাশিত নতুন কয়েকটি কবিতায় যে-ঈর্ষণীয় সারল্য লক্ষ্য করেছি তার আড়ালে, ভয় হয়, আর বেশি কিছু নেই। এলিয়টের কবিতাটিতে এক অলীক myth-এর আভাস আছে, কিন্তু সুকুমার রায়ের কবিতার তির্যক, ইম্প্রেশনিস্ট ছবিগুলির পশ্চাতে অর্থের আঁটো বাঁধুনির আভাস শুধু আভাস ব'লেই মনে হয়।

"দিনরাত সুরের ঝংকারে
থরথর দেহমন, বারে বারে করাঘাত হেনে
কি রুদ্র সন্ধানে আমি খুঁজি সেই নতুন প্রতীক।"

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা" বইটির শেষ এই কটি পংক্তি তাঁর উদ্দেশ্যের পরিচয় দেয়। সুকুমার রায়ের মতো তাঁর কবিতা প'ড়েও অনুমান করা যায় যে তিনি বাংলা কবিতার বর্তমান চেহারায় সন্তুষ্ট নন। কিন্তু যখন সুকুমার রায় বিদেশী কবিতার (অথবা বিদেশী ইমেজিস্ট কবিতার) দ্বারা আকৃষ্ট, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের চোখ ঘরের দিকে। তাঁর নিজের চোখে নিজের

চেহারাটা হ'লো : "খ্যাপা বাউলের মতো আমি তাই তোমার সন্ধানে। পাথরে কাঁটায় ক্ষত গর্বিত চরণে পথ হাঁটি। হাতে নিয়ে একতারা মাঠে-ঘাটে, সভায় মিছিলে।"

এ-প্রবন্ধে লোকমানসের সঙ্গে কবিতার অথবা শিল্পের যোগ আলোচনা করবার স্থান নেই। এমনও যদি সত্যিই হ'তো যে পুনরুজ্জীবনের একমাত্র উৎস লোকশিল্প তাহ'লেও এই পংক্তিগুলির নাটকীয়তা সমর্থনযোগ্য হ'তো না। "খ্যাপা বাউল", "হাতে নিয়ে একতারা মাঠে ঘাটে, সভায় মিছিলে", "দ্বারে দ্বারে করাঘাত হেনে", "থরথর দেহমন", "রুদ্র সন্ধান"—এর প্রত্যেকটাই বাঁধা বুলি। শেষ পর্যন্ত লোকশিল্পের আদর্শ কি এই রকম দু'হাতে এস্তার শস্তা বুলি ছড়ানো হ'য়ে দাঁড়ায় ?

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য কী এক অনির্দেশ্য কারণে জীবনের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে গেছেন যে তাঁর "তৃতীয় নয়ন" থেকে নির্গত মৃত্যু ও ঘুমের প্রার্থনায় তিনি তাঁর কবিতার বইয়ের অর্ধেকটা ব্যয় ক'রে ফেলেছেন। অনির্দেশ্য কারণে বলছি, কারণ তাঁর কবিতা প'ড়ে জানা যায় না কেন তাঁর জাগরণে এত অরুচি। বরং অন্য জায়গায় অন্য কথাই তিনি বলেন : "আমি মরতে চাই না। কি ক'রে থাকবো !" "অনেক সুন্দর আছে পৃথিবীতে"। অবশ্য কবিকে স্ববিরোধের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই দিতে হবে, কিন্তু যে-স্বাধীনতা কবির নেই তা হ'লো ভাষাকে আস্তাবলের মতো ব্যবহার করবার। নোংরা শব্দগুলি যেখানে-সেখানে ছড়ানো, এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তির ভিড়ে ঠাসাঠাসি। নমুনা হিসেবে "ঘুমের দেশ" কবিতাটির কয়েক লাইন উদ্ধৃত করি। কবিতাটির সমস্ত শব্দসংখ্যা প্রায় ষাট, তার মধ্যে "ঘুম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আঠারো বার। আঠারো লাইনে আঠারো বার। "কোথায় ঘুমের দেশ। ঘুমের আকাশে ছাওয়া দেশ। যেখানে ঘুমের রেশ। কুয়াশা বিছায় চারিধার। যেখানে ঘুমায় ঘুম আর ঘুমের ঘুমন্ত শিশু। স্বপ্ন দেখে অনন্ত ঘুমের। যেই ঘুম নির্বাণের, পরম শূন্যের। সেই ঘুম আমাতে আসুক। দুচোখে নামুক। এসো ঘুম, এসো ঘুম। আর না-জাগার সেই ঘুম।"

এঁদের তিনজনের মধ্যেই নিজস্ব ব্যক্তিগত বাচনভঙ্গি রপ্ত করার যে-চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এটুকু অন্তত শ্রদ্ধার যোগ্য। রবীন্দ্র বিশ্বাস কিন্তু চলতি ঢং

নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সব কবিতাই হয় কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির pastiche, নয় সব কয়জনের স্টাইলের অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। অবশ্য সব-কিছু চুঁইয়ে তাঁর অদক্ষতা তলানির মতো প'ড়ে থাকে। চলতি বুলির ভারে তাঁর কবিতা ভাঙা বুরুশের উপর টুথপেস্টের মতো মৃত। তাঁর বক্তব্য "এ-জীবন জুয়াড়ীর হাতে রংচটা তাস। এই প্রাণ মাতালের হাসি," "সময়ের উচ্চৈঃশ্রবা। উল্লোল ঘৃণার তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়ে অবিশ্রাম চলে। এ হৃদয় খাঁ খাঁ করে,…কি নির্জন…জনপ্রাণী নেই। শস্য নেই…পাখী নেই…শুধু রুক্ষ খড় কাঁড়ি কাঁড়ি।" (বিশ্বাস করুন, ফুটকিগুলোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রী বিশ্বাসের নিজের।) অর্থাৎ, অল্পবয়সে অনেকেরই যা মনে হ'য়ে থাকে, তাঁরও আবিষ্কার তা-ই ; অবশ্য অন্য সকলে সে-কথা আর একটু সুরুচির সঙ্গে প্রকাশ করেন। কিংবা বুদ্ধিমান ব্যক্তি একেবারেই করেন না। রবীন্দ্র বিশ্বাসের প্রত্যেক কবিতাই তাঁর পরিচিত কোনো-না-কোনো ব্যক্তিকে উৎসর্গ করা। তাঁদের প্রত্যেককে আমার সমবেদনা জানাই। আর লেখককে আমার অভিনন্দন জানাই তাঁর অদ্ভুত ভূমিকার জন্য। বাংলা ভাষার উপর তিক্ততীর প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করবো ভেবেছিলাম। "আমার কাব্যে স্খলন পতন ত্রুটিও লভ্য কিন্তু সততা-সহৃদয়তা দুর্লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য আত্মসমীক্ষার সচেতন সংবিৎ।" কিংবা সুধীন্দ্র দত্তের গদ্যের প্যারডি ব'লেও ভ্রম করা সহজ। হয়তো তিনি সুধীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গি সমর্থন করেন না, কিন্তু তাঁর অসমর্থনের প্রকাশ আর-একটু শোভন হ'লেই ভালো হ'তো।

"মুস্কিল আসানে"র কবি দিলীপ রায়ের কবিতা, বইটির প্রচ্ছদপটটির মতোই, অধিকাংশ চলতি রচনা থেকে স্বতন্ত্র। যে-পিউরিটানিজমের প্রভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে ইনি তা থেকে মুক্ত। এঁর চিন্তায় এক বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করি যা এঁকে, কবি বলতে যে-মেরুদণ্ডহীন জলীয় উদ্ভিদ-জাতীয় জীবের কল্পনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই ছাঁদের বাইরে রাখে। কিন্তু কবি হ'তে গেলে আরো কয়েকটি গুণেরও প্রয়োজন হয়। দেগাস, যিনি মাঝে-মাঝে কবিতাও লিখতেন, এক সন্ধ্যায় মালার্মেকে এসে বলেন, "আজ সারাদিন একটি সনেট লিখতে হিমসিম খেয়ে গেছি। প্রচুর ভাব জাগছে কিন্তু সনেটটির নাগাল পাচ্ছি না।" মালার্মে জবাব দিলেন, "One does not

write a poem with ideas, one writes it with words." এদিকে দিলীপ রায় নিজের সম্পর্কে জানিয়েছেন "কিছু-কিছু শুধু কথায় সাজানো সৈন্য। রং চং তার সব আছে। ভাবের শুধুই দৈন্য!" এ-থেকে বোঝা যায় আত্মচেতনা গুণটি কতই দুর্লভ মনুষ্য সমাজে।

কিন্তু কখনো-কখনো দিলীপ রায় নিজেও বোঝেন "লিখেছি যে-সব কবিতা। নয় তা কবিতা সবই তা" কিংবা, তাঁর কবিতা-প্রসঙ্গে বলেন, "যেন একখানা খাতা। আর তাতে লেখা যা, তা।" প্রশ্ন জাগে, এত কথা জানবার পরও কবিতা ছাপাবার জন্য এত তাড়াহুড়ো কি একটু দৃষ্টিকটু নয়? তাঁর অভিজ্ঞতা কখনো-কখনো সত্যই কোনো নির্ভেজাল চিত্রের মধ্য দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেয়, কিন্তু আত্মসমালোচনার অভাবে সেই ক্ষীণ আলোগুলি জঞ্জালের মধ্যে লুপ্ত হয় অতি সহজেই। তিনি লেখেন বালকের মতো, কিন্তু সময় ও অধ্যবসায় ব্যয় করলে পরিণত বয়স্কের মতো নিশ্চয় লিখতে পারবেন মনে হয়। যেমন তাঁর নতুন বই "দুই আর দুই" কোনো নিরক্ষরের কিংবা বালকের লেখা ব'লে ভ্রম হয় না। সেই জন্য তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের অপেক্ষায় থাকি, আশা রাখি যে ভালো হবে, অবশ্য যদি খুব তাড়াহুড়ো ক'রে নয় মাসের মধ্যে প্রকাশ ক'রে না বসেন। কারণ অনেক দিন ধ'রে পুরোনো মদের মতো অন্ধকারে জমিয়ে না-রাখলে, লোকচক্ষুর আড়ালে মজতে না-দিলে, সদ্য চোলাই-এর ঝাঁঝ থেকে যায়। এবং তার আগে তিনি ভাষাতীত, শুধু ভাবের ঐশ্বর্যে বিত্তবান কবিতা লেখবার বাসনা পরিত্যাগ করতে শিখুন।

৪

এই আলোচনার গোড়ার দিকে আমি লিখেছিলাম যে এই কবিদের মধ্যে কয়েকজনের শব্দচয়নে নৈপুণ্য ও সুরুচি আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাজলক্ষ্মী দেবী ও অরবিন্দ গুহের কবিতায় এই নৈপুণ্য সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করেছি। অবশ্য বিচ্যুতি কখনোই ঘটে না তা নয়। কয়েকটি উদাহরণ "হেমন্তের দিন" বইটি থেকে সংগ্রহ করছি :

> মৃত্যু আসে ঘাসে ঘাসে,—মৃত্যু আসে পাতায় পাতায়।
> ...মৃত্যুর শরশর শুনি জনাকীর্ণ ফ্ল্যাটের মাথায়।...

> ভালোবাসা, এই নামে কি যে বস্তু আছে!
> আবেগ, আশ্লেষ, লোভ, দুরন্ত কামনা,
> ক্ষণস্থায়ী প্রণয়ের ঘোর উন্মাদনা,
> ঈর্ষা লকলক করে আনাচে কানাচে।...
>
> এক মুঠো অন্ন তাও ভাগ করে খাওয়া।
> হায় হায়,
> আমাদের ভালোবাসা অগ্নিমূল্য চায়।
>
> অকরাণে ছুঁড়ে দিয়ে, হেরে গিয়ে হৃদয়ের সোনা
> যদি ভুল ক'রে থাকি—তুমি কিন্তু বিদ্রূপ কোরো না।

কিন্তু এই উদাহরণগুলির বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতার প্রকৃত আস্বাদ উৎসাহজনক, তাঁর উচ্চাশার অভাবই সে-আস্বাদের জন্য দায়ী। কবিতা-গুলি থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি নিরভিমান, দম্ভহীন, স্বল্প বাসনার পরিপূরণে সহজেই তৃপ্ত। ("জীবনের সাধারণ ছোটো সুখগুলি বরাবর। টেনেছে আমার মন। আশ্চর্যের পেয়েছি খবর। সামান্যের মুখ থেকে।") বইটির মলাট ছাই রঙের; শঙ্কা হয় এ আর-এক জীবনানন্দের ধূসর ঋতু বুঝি। অথচ এ-কবিতায় হেমন্ত ঋতু নেই, আছে এক সাধারণ খুশির রবিবার। বেশ কিছুদূর পড়বার পরও যখন ভয় হয় এ-কবিতা বুঝি সপ্তাহের কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন, শুধু অবসরের মধুর কিন্তু মৃদু সঙ্গী, শুধু "এইটুকু থাকবে সম্বল। নির্জন মুহূর্তে শান্তি, তৃপ্ত চোখে দুই ফোঁটা জল" কিংবা যেন দিনের ঘামের পর একটু আতর, তখন হঠাৎ হয়তো পাঠক আবিষ্কার করবেন "মাঝরাতে ব্যাঙ্গোর বাজনা" নামের কবিতাটি। যে-অকালে আমরা বাস করি তার সম্পর্কে তিনি সাধারণত যখন লেখেন তখন তা বক্তৃতার মতো শোনায়, রবীন্দ্র বিশ্বাসের চাইতে কম বুলি-কণ্টকিত হ'লেও চিত্রগুলি স্বকীয় ব'লে মনে হয় না, কলিকালের যে-উদাহরণগুলির উল্লেখ করেন সেগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লব্ধ নয়, যেন একালের কবি-প্রথা-নির্দিষ্ট এক অনুষ্ঠান অনিচ্ছায় পালন করছেন। "লালিত শিশুর মুখে দুধ-মার স্তন। কি স্নেহে উজাড় হয়। দু টাকা তফাতে। তবু সে চাকরি ছাড়ে। অভাব মিটাতে। দালাল গৃধ্রের হাতে কন্যা সমর্পণ।" কিন্তু উল্লিখিত কবিতায় নাটকীয়তার বদলে এসেছে অনুচ্চ চিন্তার গতির সঙ্গে

সুসমঞ্জস অন্য এক সুর। অতি পরিচিত ধারণাগুলি স্বচ্ছ উপমায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। নীতিকথার মতো শেষে কোনো সহজ ভরসা দেবার চেষ্টা নেই, তিনি জানেন বিশ্বব্যাপী অসারতার মধ্যে ছোটো যে-সব সুখ আছে সেগুলি সত্য হ'লেও এতই তিলপরিমাণ যে কালান্তর আনতে পারে না। "মাঝরাতে ব্যাঙ্গোর বাজনা। এনে দেয় অনুতপ্ত ঈশ্বরের অপটু সান্ত্বনা।"

অরবিন্দ গুহের কবিতা নিয়ে কখনো খুব একটা হৈ-চৈ হয়নি, কিন্তু "আধুনিক বাংলা কবিতা" সংকলনে গ্রহণ ক'রে বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুশীলনের যে-স্বীকৃতি দিয়েছেন তা বহু পাঠকের সমর্থন লাভ করবে। কী ক'রে যুগান্তকারী না-হ'য়েও বিশেষ হওয়া যায় তার উদাহরণ অরবিন্দ গুহ। তাঁর পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ কবিতাগুলি কোনো নতুন চেতনার জন্ম দেয় না, তবু তৃপ্তি দেয়। কী ক'রে তিনি বিপ্লবী না-হ'য়েও বিশেষ হলেন সেই কারণের অনুসন্ধান করলে অন্যান্য তরুণ কবিরা লাভবান হবেন। প্রত্যেক যুগের প্রধান কবিদের চতুর্দিকে এ-রকম নিপুণ অপ্রধান কবিদের প্রয়োজন আছে, আর-কিছু না হোক অন্তত মুখ-বদলের জন্য।

অরবিন্দ গুহ নতুন কোনো ভাষা সৃষ্টি করেননি, কিন্তু রুচির সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করেছেন। ছন্দ নিয়ে অগুনতি পরীক্ষা করেননি, কিন্তু একটি কি দুটির অন্তত ব্যাবহার জানেন। এবং, সবচেয়ে যা মূল্যবান, তিনি অভিজ্ঞতাকে অনন্য ও মূর্ত করতে পারেন প্রত্যেকটি ঘোষণার আড়ালে একটি ঘটনার ছায়া ফেলে, একটি নাটক সৃষ্টি ক'রে। তাই তাঁর লিরিকগুলি আমিত্বের ভারে নুয়ে পড়ে না, কোনো কল্পিত চরিত্রের মুখে জীবনের কোনো তীব্র মুহূর্তের অসতর্ক স্বীকারোক্তির মতো শোনায়। এবং চরিত্রগুলি প্রায় আমাদের সমসাময়িক। তারা যদিও রুশদেশের বৈদেশিক ব্যাণিজ্য আছে কি নেই এ-সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামায় না; ঈশ্বর, অর্থনীতি, শান্তি কোনো বিষয়েই তাদের কৌতূহল নেই, তবু তারা তাদের সংকীর্ণ বোধের জগতে আমাদের অনুরূপ ভাষায় কথা বলে। তাদের জগতে শুধু একটি ঘটনাই ঘটে ও তা-ই নিয়ে তাদের যত কিছু সমস্যা। অসার্থক যৌন সম্পর্কের কাহিনীতে যত নাটকের সম্ভাবনা, অন্য কিছুতে বোধহয় তত নেই। সেই সম্ভাবনা, অরবিন্দ গুহ অনেক কবিতাতেই ব্যবহার করেছেন।

"অলস মুহূর্তের প্রার্থনা" "দক্ষিণ নায়কে"র সবচেয়ে ভালো কবিতা। যার কণ্ঠস্বর আমরা এ-কবিতায় শুনি সে-ব্যক্তি লেখকের কল্পিত অসার্থক, সংকুচিত চরিত্রদের অন্যতম, যে তার ঈপ্সিতার রোগশয্যার পাশে এসে, অন্যদের অসতর্কতার সুযোগে, মেয়েটির স্পর্শ প্রথম পেল। কবিতাটি এই মুহূর্তের আগে ও পরে তার ভয়, সন্দেহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। "দক্ষিণ নায়কে"র অন্যান্য চরিত্রের মতোই সেও এই তীব্র মুহূর্তের অভিজ্ঞতা থেকে যা লাভ করে, তা শুধু স্নায়বিক বিকার। মুহূর্তের জন্য শুধু মনে হয় এ-অভিজ্ঞতা "মায়াবী", তার সমস্ত জীবন বদলে দেবে, তাকে তার অন্তভাবী সংকোচের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আবার পুরোনো অভ্যাসের বশে ভাবালু বুলি আওড়ায়। "ভয়ে বুক কাঁপে, আর থাক। মনে মনে তার নাম। গান হয়। অসুখের ছলে তার যেটুকু নিলাম। তা অনেক।" আর তার পরেই সে প্রার্থনা করে আবার সেই অলৌকিক, বিধিদত্ত মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি; কারণ সে স্বাধিকার ব'লে কখনোই কিছু অর্জন করতে পারবে না, অসুখের ছলে কিছু পেলেও বা পেতে পারে।

৫

মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা লেখার ক্লাশ আছে। এ-দেশেও হ'লে হয়তো ভালো হয়। তাহ'লে হয়তো অপাঠ্য রচনা এত ছাপানো হ'তো না। হয়তো মাধ্যমিকই থাকতো, এবং ছোটো সুখ-দুঃখের মনোরম, নিপুণ চিত্র আরো রচনা করা হ'তো। অরবিন্দ গুহের মতো কবির সংখ্যা বাড়তো। সে-লাভ কম কী?

অবশ্য শুধু ভালো নয়, অনেক কবিতায় যে আরো কিছু থাকে সে "আরো কিছু" স্কুল-কলেজের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গেই সহজলভ্য হ'য়ে যাবে না। ভাষা-চেতনার ও কবিতার ধারণার যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন না-হ'লে কল্পিত কবিতাগুলি অলিখিত থাকবে, সেই পরিবর্তনের লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না, শুধু এ-দেশে কেন, কোনো দেশেই নয়। এবং কে জানে সেই পরিবর্তন শুধু শিল্পীর চেষ্টার উপর নির্ভরশীল কিনা। শিল্পে এ-রকম যুগান্তকারী যত পরিবর্তন, সবই ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই আদিযুগ থেকে ঘ'টে এসেছে।

অবশ্য এই যুক্তি হ'লো সমস্ত কুকবি ও অকবির আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু তাঁরা আগে আবিষ্কার করেন যে জগতে পরিবর্তন ঘটেছে ও পরে কবিতায় সেই পরিবর্তন বর্ণনা করেন। আর সৎকবি শিল্পের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে পৃথিবীরও পরিবর্তন হয়েছে ব'লে অনুমান করেন। অকবির ধারণা, শিল্পীর দায়িত্ব সাংবাদিকের, শিল্পের অনন্যতা তাই তাঁর বোধগম্য হয় না, বক্তব্য ও প্রকরণের প্রভেদ তাঁর কাছে এতই স্পষ্ট। সৎকবি এর প্রত্যেকটি ধারণাকে অস্বীকার করেন, কারণ শিল্পকে তাঁর মনে হয় অজ্ঞাতপূর্ব চেতনার ভাষার স্বভাবের সাহায্যে বিকাশ, শিল্পকর্মটি জন্ম নেবার পূর্বে যে-চেতনার স্বরূপ-নির্ধারণ অসম্ভব ছিল। শিল্পী, তাই, না সমালোচক, না রাষ্ট্র, কোনো অধিকর্তার নির্দেশে সৃষ্টি করতে পারেন না। কারণ যে-অর্থ কবি আবিষ্কার করেন তা সৃষ্টির মুহূর্তে ব্যক্তিমানসের নিভৃতে মূর্ত হয়ে ওঠে; পূর্বেই যদি তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলতো তবে স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের প্রয়োজন থাকতো কোথায়? আগে থেকে যাঁরা জানেন আগামী দিনের কবিতা শ্রমিক-সমাজের সামাজিক চেতনার কোন অংশকে রূপ দেবে, তাঁদের শিল্পচর্চা অসফল হওয়া অনিবার্য। কবিতায় পরিবর্তন কাম্য, পরিবর্তন আসবেও, কিন্তু পূর্ব-নির্দিষ্ট মার্ক্সীয় (বা অন্য কোনো শাস্ত্রসম্মত) চেহারা নিয়ে কোনো দেশেই আসবে না।

শিল্পের বক্তব্য তার সম্পূর্ণ রূপের মধ্যে বিকশিত। বাইরের পৃথিবীকে শিল্প তার নিজস্ব ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করে ব'লে যেমন ভবিষ্যৎ শিল্পের রূপ নির্দেশ ক'রে দেওয়া যায় না, তেমনি তার বক্তব্য কিংবা চিত্রকল্পও আইন ক'রে বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। ইতালীয় ফিউচারিস্ট মারিনেত্তি ঘোষণা করেন যে আগামী যন্ত্রের যুগে কবিতার চিত্রকল্পকে যন্ত্রের উপমানির্ভর হ'তেই হবে। ইতালীয় কবিতায় কিন্তু মারিনেত্তির প্রভাব অতি অল্পদিন টেঁকে, এবং ইতালীয় সমালোচকদের মতে তাঁর চেয়ে বরং উনগারেত্তি যন্ত্রযুগের ভাষার যথার্থ রূপ দিয়েছেন, যদিও কোনো যন্ত্রের বর্ণনা তাঁর কবিতায় নেই।

সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক পরিবর্তনও কবির মনের রসায়নে বিচিত্র রূপান্তর লাভ করে। সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিকের মতে উনিশ শতকের ক্রান্ত বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিজয়গৌরবের কাল। সেকালের উঠতি শ্রমিক-শ্রেণী

ও পরাজিত সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীবর্গ, উভয়েই বেনেজাতির অর্থসর্বস্ব জীবনধারার বিরোধিতা করে। অথচ প্রধান শিল্পী কয়জন, যেমন বোদলেয়ার, অপ্রধান কবি লামার্তিনের মতো আগামী সমাজের কথা না-লিখে, বিগত "সামন্ততান্ত্রিক" মূল্যবোধে সিক্ষিত থেকেই শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন।

অনেক সমাজ-সচেতন ব্যক্তি আজ হস্তক্ষেপ করতে চান শিল্পীর সেই অধিকারে, যার দ্বারা তিনি পৃথিবীকে শিল্পের মধ্যে রূপান্তরিত করেন। যদি বর্তমান পৃথিবীর অঙ্গে ভয়ানক অসুখ থাকে, তাহ'লেও, ভবিষ্যতের কথা ভেবে, জীবনের জয়গান লিখতে বলেন। কিন্তু শিল্পীর প্রধান দায়িত্ব নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত ক'রে দিয়ে নিজেকে উপস্থিত সত্যের সামনে উন্মোচিত করা, যাতে অভিজ্ঞতা ও ভাষার আবর্তে, কবির মনের ছাঁকনিতে চুঁইয়ে কবির দক্ষ ভাষা চেতনার আগুনে গ'লে, সেই সত্য তার নিজস্ব শিল্পসম্মত আকার নেয়। অতএব না ভূত বা ভবিষ্যৎ কোনো প্রভুই বর্তমান থেকে শিল্পীকে বিচ্যুত করতে পারেন না। শিল্পের মূল্যই তো তার সমকালের প্রতি আসক্তিতে; যেহেতু কাল প্রবহমান সেইজন্য তীব্র ক্ষণগুলিকে চিরন্তন করবার এই ক্ষমতা এত মূল্যবান।

এবং কোনো প্রভুই শিল্পীকে সুনীতিবাগীশ ক'রে তুলতে পারেন না, যদি শিল্পী দেখেন যে শিল্পকর্মের মধ্যে পৃথিবীর অঙ্গের সেই অসুখের চিহ্ন আছে। কোনো প্রভুই শিল্পীকে মিথ্যাবাদী হ'তে বাধ্য করতে পারেন না। শিল্পী সকল কালের কাছে তাঁর কালের সঞ্জয়-দূত, যদি ভালো ভেবেও মিথ্যা ব'লে অজ্ঞানতা উপহার দেন তবে পৃথিবীর সত্যিকার অনিষ্ট করেন তিনি, এবং নিজের কাপুরুষতার পরিচয় দেন। দুঃখদায়ক হ'লেও সত্যকে যিনি দেখতে জানেন তিনি জ্ঞানী, এবং জ্ঞানই পৃথিবীর পরিবর্তন আনতে পারে, মূর্খতা নয়।

বাংলা কবিতায় এক "জীবনবোধে"র চল হয়েছে, যে-বোধে দীক্ষিত ব্যক্তিরা যে-কোনো অবস্থাতেই তাঁদের কবিতায় পৃথিবীর কোথাও যে কোনো অন্যায় অথবা অসুখ থাকতে পারে, এ-কথা স্বীকার করেন না। এঁদের আশাবাদের চেয়ে নৈরাশ্যজনক আর-কিছু নেই। কারণ ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব পৃথিবীর পক্ষে অমঙ্গলের। অসুখের অস্তিত্ব এমনিতে অস্বীকার করেন না হয়তো, কিন্তু শিল্পে তার প্রকাশ এঁরা সহ্য করেন না।

বাংলা কবিতার পক্ষে এটা আশঙ্কার কথা। তবে প্রত্যেক দেশেই কোনো-কোনো কালে এঁদের সংখ্যাধিক্য দেখা গেলেও সৎকবিরা বিভ্রান্ত হন না। নিজেদের চারপাশের এই ভ্রান্ত চিন্তার মধ্যেও যে অরবিন্দ গুহ কুমারীদের দেহের বা আত্মহত্যার বিষয়ে লিখতে সাহস পান, কিংবা দিলীপ রায় দৈহিক কামনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এ-জন্য তাঁরা অনুমোদন-যোগ্য। সর্বসমক্ষে অসংকোচ হ'লেই ভালো কবি হওয়া যায় না, কিন্তু শব্দ বা বিষয় সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ত হ'লে কবি হওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। ছোটোখাটো টেনিসন কিংবা সাগিটারিয়স হবার যাঁদের ইচ্ছে, প্রতি বছর শারদীয় সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হ'য়েই যাঁরা তৃপ্ত, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

KAVITA
(Poetry)

Yearly Rs. 4/-, or 8s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy.
এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India
Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE
Assistant Editor : NARESH GUHA

Printed at Swapna Press Ltd., 9/1, Lallbazar Street, Calcutta-1.

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক : নরেশ গুহ। ৮।১ লালবাজার ষ্ট্রীট, স্বল্পা প্রেসে মুদ্রিত ও ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।